গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৬ সংখ্যা ২ - ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কৃষিতে বিদ্যুৎ মাশুল দ্বিগুণেরও বেশি

হাজার হাজার প্রতিবাদী কৃষকের দৃপ্ত মিছিলে কাঁপল কলকাতা

দীর্ঘদিন পরে গত ২৫ আগস্ট মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র মধ্যকলকাতা গ্রামীণ কৃষকদের পদধ্বনিতে আবার কেঁপে উঠল। কৃষক আন্দোলনের মরা গাঙে বান ডেকে গেল। শান্তিপ্রিয় কৃষক আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সংঘবদ্ধ হলে তার চেহারা কেমন হয় — এদিন প্রত্যক্ষ করল কলকাতা। হাজারে হাজারে এদিন তারা সমবেত হয়েছিল কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। শাসকদলের কোন প্রলোভন কোন বাধা তাদের আটকাতে পারেনি। কোন স্তোকবাক্য তাদের নিরস্ত করতে পারেনি। কারণ আঘাতটা গুরুতর, আঘাতটা এসেছে সরাসরি। এক ধাক্কায় বিদ্যুতের মাশুল ১০০ শতাংশেরও বেশি বাড়ানো হয়েছে। যাঁকে দিতে হত বিদ্যুতের জন্য বছরে ৫,৪৬০ টাকা, নতুন ফতোয়ায় তাঁকে দিতে হবে ২০,৯৩০ টাকা। ২০০৫-০৬ সালের জন্য গরিব মধ্যবিত্ত গ্রাহক, ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প ও কৃষকদের সেচে এই হারে বিদ্যুৎ মাশুল চাপানো হয়েছে। বঞ্চিত কৃষকদের ক্ষোভের বারুদে এই নির্দেশ অগ্নি সংযোগ ঘটিয়েছে।

এই অস্বাভাবিক অকল্পনীয় মাশুলবৃদ্ধি কোনমতেই মেনে নিতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা। প্রতিরোধ শুরু হয়েছে জুলাই মাসে, প্রথম বর্ধিত বিল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, হাজার হাজার অসংগঠিত কৃষক নিজেরাই শুরু করেছে বিল বয়কট। ফেরৎ দিয়ে এসেছে বর্ধিত বিল পর্ষদ অফিসে, জানিয়ে এসেছে 'বর্ধিত বিল দিচ্ছি না, দিতে পারছি না।' তারপর চলেছে ঘেরাও অবরোধ। ২৯ জুন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অফিসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল কয়েক হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক।

শাসকদলের এবং তথাকথিত বিরোধী দলের বড় বড় কৃষক সংগঠন রয়েছে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তারা নীরব দর্শক। কৃষকরা হয়ে পড়েছিল প্রতিবাদহীন মূক। তারা গুমরে মরছিল, কিন্তু পথ পাচ্ছিল না প্রতিকারের। 'অ্যাবেকা' (অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন) তাদের পথ দেখাল। ১৯ জুলাই রাজ্যব্যাপী ১ ঘণ্টা পথ অবরোধে কৃষকদের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা, ঐকান্তিকতা এবং সংগ্রামী মেজাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল তাদের মধ্যে বিক্ষোভ কত গভীর। এদিনের আন্দোলনকে ভাঙতে পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেফতার, থানায় নিয়ে গিয়ে পেটানো — সব রাস্তাই

নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কিছু দিয়েই কৃষকদের মনোবল ভাঙা যায়নি। এই বিক্ষোভকে আরো সংগঠিত রূপ দিতে গত ১ মাস ধরে সংগঠনের কর্মীরা সেচ-সেবিত কৃষি এলাকায় ছোট-বড় বহু মিটিং করেছে, বহু আঞ্চলিক সম্মেলন হয়েছে, গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে আন্দোলনের কমিটি। এই কমিটিগুলির আহ্বানে ২৫ আগস্ট ২০ সহস্রাধিক কৃষকের সমাবেশ কলকাতার বুকে আন্দোলনের নতুন দিশা দেখিয়ে গেল। কলকাতা মহানগরী প্রতিদিন বহু মিছিল প্রত্যক্ষ করলেও ভুলেই গিয়েছিল কৃষক আন্দোলনের কথা। ২৫ আগস্ট বিগত দিনের কৃষক আন্দোলনের বিস্মৃত গৌরবময় ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দিল। তবু এদিন সকাল থেকে কৃষ্ণনগরের কাছে দুর্ঘটনায়

সাতের পাতায় দেখুন

৯ সেপ্টেম্বর

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, চীন বিপ্লবের রূপকার

কমরেড মাও সে-তুঙ স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে, বিকাল ঃ ৪টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

মহান মাও সে-তুঙ স্মরণে

''কিছু কমরেড আছেন যাঁরা দলের সামগ্রিক স্বার্থ না দেখে কেবলমাত্র অংশবিশেষের স্বার্থ দেখেন। তাঁরা সর্বদাই দলের কাজের সেই অংশের উপরই অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করেন যে কাজের দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত এবং তাঁদের নিজেদের কাজের সেই অংশটুকুর তুলনায় দলের সামগ্রিক স্বার্থকে তাঁরা সবসময় গৌণ করে দেখাতে চান। দলের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পদ্ধতিটি তাঁরা বোঝেন না। তাঁরা উপলব্ধি করেন না যে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজন কেবলমাত্র গণতন্ত্র নয়, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন কেন্দ্রিকতার।....

'ব্যক্তিস্বাধীনতা'কে যারা গুরুত্ব দেন তাঁরা সাধারণতঃ 'আমি আগে' এই তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত এবং বলাবাহুল্য ব্যক্তি ও দলের সম্পর্কের প্রশ্নে সাধারণভাবে এই চিন্তা ভ্রান্ত। যদিও মুখে দলের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁরা জোরের সাথেই ঘোষণা করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদেরকে প্রথমে এবং পার্টিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখেন। আসলে এই সমস্ত লোক কী চান? এঁরা চান যশ, পদ ও সবসময় পাদপ্রদীপের সামনে থাকতে। যখনই এঁদের উপর কাজের কোন বিশেষ শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাঁরা 'স্বাধীন ইচ্ছা' জাহির করেন। এই লক্ষ্য থেকে তাঁরা কিছু মানুষকে নিজের বশংবদ করে তোলেন এবং বাকিদের দূরে ঠেলে দেন। কমরেডদের মধ্যে তাঁরা আত্মম্ভরিতা, বাগাড়ম্বর, স্তাবকতা ও দালালীর মনোভাব নিয়ে আসেন এবং এইভাবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের নোংরামি ও বদঅভ্যাস-গুলিকে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে তাঁরা আমদানি করেন। এঁদের এই অসততাই এঁদের জীবনে বেদনাদায়ক পরিণতি নিয়ে আসে। আমি মনে করি, সততার সাথেই আমাদের কাজ করা উচিত। কেননা, সৎ মনোভাব ব্যতিরেকে এই দুনিয়ায় কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারা সৎ মানুষ? মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন ছিলেন সৎ মানুষ। যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন, তাঁরা সৎ মানুষ। অসৎ মানুষ কারা? ট্রটস্কি, বুখারিন, চেন তু সিউ, চাঙ কুও তাও — এরা হচ্ছে চূড়ান্ত অসৎ এবং যাঁরা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র উপর গুরুত্ব দেয় তারাও অসৎ। যারা ধূর্ত, যাদের কাজের মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, যারা নিজেদের অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ও চালাক মনে করে, তারা আসলে অত্যন্ত বোকা এবং তাদের দ্বারা কোন ভাল কাজই হওয়া সম্ভব নয়। .... ব্যক্তিবাদ ও সংকীর্ণতাবাদকে আমাদের প্রতিহত করতেই হবে যাতে আমাদের সমগ্র পার্টি এক অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছবার সংগ্রামে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারে।''

(পার্টির কর্মপদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত করুন)

২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ — ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

সুপ্রিম কোর্টের রায়

শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার দরজা হাট করে দেবে

আন্দোলনের ডাক এ আই ডি এস ও'র

গত ১২ আগস্ট ২০০৫, সুপ্রিম কোর্টের সাত সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চের একটি রায় যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স' বা 'কমন এন্ট্রান্স' পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির প্রচলিত প্রথাকে এই রায় বাতিল করে দিয়েছে এবং বেসরকারি মালিকানাধীন মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ম্যানেজমেন্টকেই ছাত্র ভর্তি ও ফি নির্ধারণ করার পুরোপুরি অধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিচালিত বোর্ডের দ্বারা 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স' বা 'কমন এন্ট্রান্সে'র মতো পরীক্ষায় পাশ করার নিয়মকেই 'সরকারি কোটা' ব্যবস্থা নাম দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করেছে। এর ফলে, যারা বিপুল পরিমাণে টাকা খরচ করতে পারবে তারাই কেবল মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রফেশনাল কোর্সগুলিতে পড়ার সুযোগ পাবে এবং শিক্ষায় বিনিয়োগকারীদের মুনাফাবৃদ্ধির সুযোগ বাড়বে বহুগুণ। পাশাপাশি এনআরআই কোটা রাখার অধিকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোর্ট দিয়েছে। এন আর আই কোটার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করারও অবাধ সুযোগ পাবে।

১৯৯২ সালে মোহিনী জৈন মামলায় যেখানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কুলদীপ সিং ও বিচারপতি সহায়-এর ডিভিশন বেঞ্চ শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতেই ভর্তির নির্দেশ দিয়েছিল, সেখানে পরবর্তীকালে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চগুলির রায়ের মধ্য দিয়ে মেধার পরিবর্তে ক্রমাগত ম্যানেজমেন্ট কোটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের ১১ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ ও পরবর্তীকালে পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চের রায়েও ম্যানেজমেন্টের স্বার্থই বেশী বেশী করে রক্ষিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের এই ধারাকে লক্ষ্য করেই এ আই ডি এস ও'র আশঙ্কা ছিল যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা যেভাবে আরো বেশি সুযোগ- সুবিধা দাবি করছে, তা হয়তো ঢালাও বাণিজ্যিকীকরণের এই জয়ধ্বনির সময়ে অচিরেই পূরিত হবে। তাই গত বছর ২৪ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও পার্লামেন্ট অভিযান করে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী অর্জুন সিং-এর কাছে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের রায় অকার্যকর করতে (১) মেধা তালিকার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি (২) ম্যানেজমেন্ট কোটা বাতিল ও (৩) সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নাগালের মধ্যে ফি নির্ধারণ করার উপযুক্ত আইন প্রবর্তন করার দাবি জানায়। বিভিন্ন রাজ্যেও এ আই ডি এস ও তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে এবং বহু রাজ্যে বহু দাবি আদায় করতেও সক্ষম হয়। কিন্তু গত এক বছরে সিপিএম সমর্থিত ইউ পি এ সরকার আইন প্রণয়নের কোন উদ্যোগ নেয়নি। বরং ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজনৈতিক দলের রং নির্বিশেষে প্রতিটি রাজ্য সরকার শিক্ষাকে আরো বেশি করে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করার জন্য নানারকম নীতি গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবাংলার সিপিএম নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার আরো এক ধাপ এগিয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজেও নজিরবিহীন ভাবে এনআরআই কোটা চালু করার চেষ্টা করছে। এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন ও আইনি লড়াই-এর ফলে রাজ্য সরকার পরাস্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরাজ্যেও যথেচ্ছ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার অধিকার ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছে। শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামোহীন এইসব প্রতিষ্ঠান কীভাবে নিছক মুনাফার স্বার্থে চলছে, তা অজানা নয়। এখানে হাজার হাজার টাকা ফি হিসাবে নেওয়া হয়। অনদিকে রাজ্য সরকার বিভিন্ন কলেজকে সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স চালু করার অধিকার দিয়ে টাকা কামানোর সুযোগ করে দিয়েছে। এ ধরনের এক একটি পাঠক্রমে বছরে ২৫/৩০ হাজার টাকা ছাত্রদের কাছ থেকে নেওয়া চলছে। কেন্দ্রের সরকার পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের নেতৃত্বে যে কমিটি বসিয়েছিল, তারাও সেলফ্ ফিনান্সিং কোর্স চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে। এই ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে যে, সিপিএম নেতৃত্ব আদৌ শিক্ষায় ব্যবসায়ীকরণের তথা বিপুল হারে ফি-বৃদ্ধির বিরোধী তো নয়ই, বরং সরকারের অর্থাভাবের অজুহাত তুলে সেটাই তারা এ রাজ্যে করে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও যখন আন্দোলন করেছে, তখন তার বিরুদ্ধতা করেছে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই। এ রাজ্যে সরকারি মেডিকেল শিক্ষায় এনআরআই কোটার পক্ষেই প্রকাশ্যে সওয়াল করেছেন এসএফআই নেতারা। ফলে, আজ সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোবার পর সিপিএম ও এসএফআই নেতাদের মুখে ছাত্রদরদের যেসব কথা শোনা যাচ্ছে তা নিতান্তই ভুয়া। ইউপিএ সরকারও ভণ্ডামি করছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধতা করে এসএফআই নেতৃত্ব কার্যত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫০ শতাংশ ম্যানেজমেন্ট কোটায় সংরক্ষণকে সমর্থন করেছে। এটাকেই তারা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বলে দেখিয়ে পরোক্ষে ম্যানেজমেন্ট কোটার পক্ষেই যুক্তি করছে। প্রচলিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা সফল ছাত্রের ভর্তির সাথে 'কোটার' কোন সম্পর্ক নেই। তাই এস এফ আই-এর প্রচারে ছাত্রসমাজকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও দাবি তুলেছে —

(১) অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের রায় রদ করতে পার্লামেন্টে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেধার ভিত্তিতে সমস্ত আসনে ছাত্র ভর্তি করতে হবে, ছাত্রদের বেতন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং ম্যানেজমেন্ট কোটা বা বর্ধিত বেতনদাতাদের জন্য বিশেষ কোটা ও এনআরআই কোটা বাতিল করতে হবে ;

(২) উচ্চ শিক্ষায় সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স চালু করার কান্তি বিশ্বাস কমিটির সুপারিশ বাতিল করতে হবে ;

(৩) শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের সমস্ত নীতি বাতিল করতে হবে।

উপরোক্ত দাবিগুলি আদায়ের লক্ষ্যে এ আই ডি এস ও গত ২৪ আগস্ট '০৫ সারা ভারত ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। এই রাজ্যেও ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হওয়ায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে দাবি আদায়ের জন্য আরো বৃহত্তর ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই দাবিগুলি নিয়ে ১লা সেপ্টেম্বর, ছাত্র শহীদ দিবসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার ছাত্র রাজভবন অভিযান করে।

ব্যারাকপুরে শ্রমিক সম্মেলন

গত ১৫ আগস্ট ব্যারাকপুর মহকুমার হাজিনগরে বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্তর্গত নৈহাটি জুট মিল ইউনিটের সম্মেলন বিপুল উদ্দীপনার সাথে সম্পন্ন হয়। সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন এবং শহীদবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। এরপর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড বদরুদ্দিন সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন। সম্মেলনে ৫৪ জন শ্রমিক প্রতিনিধির মধ্যে ১২ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বি জে এম ডব্লু ইউ নৈহাটি ইউনিটের সভাপতি কমরেড অমল সেন। সম্মেলনে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বেঙ্গল জুট মিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড রামশঙ্কর সিং। প্রধান অতিথি ছিলেন বেঙ্গল জুট মিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর রাজ্য সহ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। কমরেড ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে মালিকশ্রেণী এবং তার তল্পিবাহক সরকারের শ্রমিকদের উপর নামিয়ে আনা তীব্র আক্রমণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এর বিরুদ্ধে সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, মার্কস দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া শোষণব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে যে শ্রমিক, আগে তাকে বুর্জোয়া চিন্তা, বুর্জোয়া সংস্কৃতি ছাড়তে হবে, ব্যক্তিসম্পত্তি-বোধমুক্ত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে হবে। এই সংগ্রামে তিনি এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলিকে চর্চা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে আটকে থাকলে শ্রমিকের মুক্তি আসবে না, শ্রমিক আন্দোলনকে সাম্যবাদ চর্চার স্কুল হিসাবে পরিচালনা করতে হবে। ইউনিয়নের কর্মী এবং সদস্যরা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার শপথ নেন।

মহেশতলায় শ্রমিক সম্মেলন

২৪ আগস্ট মহেশতলার চন্দননগরে ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর প্রথম আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড অনির্বাণ সিনহা। আগত প্রতিনিধিরা প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন। বক্তব্য রাখেন কমরেড শিলাজিৎ সান্যাল ও ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর পক্ষে কমরেড তিমিরবরণ ঘোষ। কমরেড ফজলুর পিয়াদাকে সভাপতি এবং কমরেড সামসের হালদার ও কমরেড ইসা আলি পুরকায়েতকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ১৮ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

ছত্তিশগড়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

দুর্গের কৈলাশনগরে নেতাজী সুভাষ প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে ১৪ আগস্ট বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, দুর্গের ডাঃ অজয় গুপ্তা, ডাঃ দিব্যা শ্রীবাস্তব, ডাঃ এন কে বর্মা, ডাঃ বৃন্দা মাডগে এবং ডাঃ রেখা চৌহান ঐ শিবিরে প্রায় ৫০০ রোগীর চিকিৎসা করেন এবং ওষুধ বিতরণ করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

'কোর' শিল্পেও বেসরকারীকরণ

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইন্ডিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কয়লা খননের কাজ পুরোটাই বেসরকারি হাতে তুলে দেবে।

এই প্রথম কোল ইন্ডিয়া সার্বিক বেসরকারীকরণের মতো একটা সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মতামতের তোয়াক্কা না করেই। তারা নিজেরাই বলছে, বর্তমানে যে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার কর্মী খনন কার্যে নিয়োজিত, বেসরকারি হাতে তুলে দিলে কয়েক বছরের মধ্যেই তা অর্ধেক হয়ে যাবে, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হবে। এই খনন কাজ বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে দরপত্র (টেন্ডার) চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রয়োজনে ঐ সংস্থা কয়লা তোলার জন্য স্থায়ীভাবে খনিগুলিতে যন্ত্র বসাতে পারে।

সিপিএম সমর্থিত ইউপিএ সরকার বেসরকারীকরণের প্রশ্নে এতদিন বলে এসেছে যে, তারা দেশের 'কোর' শিল্প বেসরকারি হাতে দেবে না। তবে কি তা ছিল শুধু জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ?

মেদিনীপুর

গণবিক্ষোভে পঞ্চায়েত কর চালু হতে পারল না

পরিষেবা খাতে ব্যয় সংকোচনের পাশাপাশি জনগণের উপর পঞ্চায়েত উপবিধির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কর চাপাতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেই উদ্দেশ্যে গত ১৭ আগস্ট শান্তিপুর ২নং অঞ্চলে পঞ্চায়েত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে একটি জরুরি সভা ডাকেন। এস ইউ সি আই, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন, গণসংগ্রাম কমিটি ও বুড়ারী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা উক্ত সভায় পঞ্চায়েত কর উপবিধি বাতিলের দাবি জানান। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল উক্ত উপবিধি চালুর পক্ষে মত দেয়।

ঐদিন গণসংগ্রাম কমিটি এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন হয়। শতাধিক মানুষের এই বিক্ষোভ সভায় গণসংগ্রাম কমিটিগুলির বিভিন্ন গ্রামীণ শাখার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সুদর্শন অধিকারী, রতন মাইতি, তাপস সামন্ত ও মানিক জানা। ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে উপবিধি কার্যকরী হতে চলেছে জানতে পেরে গণসংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত প্রধান ও প্রতিনিধিদের ঘেরাও এবং অঞ্চল অফিস অবরোধ করা হয়। আন্দোলনের চাপে পঞ্চায়েত সদস্যরা এবং উপপ্রধান বলতে বাধ্য হন, 'আমরা এই সভায় উপবিধি কার্যকর করার কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না।'

আন্দোলনের এই বিজয়ে সুসজ্জিত একটি মিছিল হয়। এস ইউ সি আই দলের উদ্যোগে বুড়ারীতে এক পথসভার আয়োজন হয়। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই বুড়ারী লোকাল কমিটির সম্পাদক কার্তিক বেরা ও সন্তোষ সী।

সিলিং বাতিলে সরকার তৎপর

কৃষকদের জমি গ্রাস করার মালিকী ষড়যন্ত্র

উপনগরী গড়ার জন্য দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে ঢালাও কৃষিজমি তুলে দেওয়ার পথে প্রচলিত জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন বাধা হওয়ায় সিপিএম ফ্রন্ট সরকার সেই আইন পাল্টে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়েছে অনেকদিনই। তারা আইন পাল্টাবার জন্য সংশোধনী বিলও তৈরি করেছিল। তাতে বলা হয় — (১) নানা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এবং বিশেষ করে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের জন্য কোন ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানি এখন থেকে সিলিং-ঊর্ধ্ব জমির মালিক হতে পারবে, (২) রাজ্যের বন্ধ কারখানাগুলির যে জমি রয়েছে শিল্পপতিরা তার বাণিজ্যিক ব্যবহার বা প্রয়োজনে তা বিক্রি করে দিতে পারবে। এভাবে জমির শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তন করা নিয়ে সিপিএমের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে। এবং ৫ আগস্ট বিধানসভায় বিলটির উপর সরকার পক্ষ থেকেই সংশোধনী এনে ওই দুটি ধারা বাতিল করা হয়। কিন্তু প্রশ্নের সমাধান তাতে হয়নি। সিপিএম নেতৃত্ব বলছে, শিল্পের জন্য জমি দিতে হবে, সেজন্য কৃষিজমিই চাই, সিলিংও তুলতে হবে। ওদের ভাবখানা হল — যদি উন্নয়ন চাও তবে জমি দিতে হবে এবং যদি জমি দিতে হয় তবে ঊর্ধ্বসীমা আইন তুলে না দিয়ে উপায় কী? আর এতে যদি হাজার হাজার কৃষককে বাস্তুচ্যুত-গৃহচ্যুত করে পথে দাঁড় করিয়ে দিতে হয় তবে উন্নয়নের মুখ চেয়ে তাকেও মেনে নিতে হবে।

সিপিএম ফ্রন্ট হঠাৎ করে এই নীতি নিয়েছে ভাবলে ভুল হবে। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন — ''মুক্ত অর্থনীতির ফলে কৃষিকাজে পুঁজিবিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তাই পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধনী দরকার।'' (আনন্দবাজার, ১১-৫-৯৭) রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ডেকে নিয়ে এসে তাদের নানা ধরনের সাহায্য দেওয়ার প্রক্রিয়া সিপিএম অবশ্য আগেই শুরু করেছে। বাধাহীনভাবে যাতে পুঁজিপতিদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় এজন্য তখন থেকেই তারা পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের নানা ধারা উপধারা সংশোধন শুরু করে দেয়। ১৯৯৬ সালে ভূমিসংস্কার আইনের ১৪(জেড) ধারার সংশোধন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল — রবার ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি যোগাড় করা। ২০০০ সালে আবার 'পঃবঃ ভূমিসংস্কার আইনের' সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনীতে বলা হয় — ''বর্গাদার রয়েছে এমন জমিতেও যাতে শিল্পস্থাপন ত্বরান্বিত করা যায়, এজন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫-র ২০বি ধারা সংশোধন করা হল।'' অর্থাৎ শিল্পস্থাপনের নামে পাকাপাকিভাবে বর্গাদার উচ্ছেদের আইনি ব্যবস্থা তখনই করা হয়েছিল। যত দিন গিয়েছে সিপিএম ও দেশি-বিদেশি শিল্পপতি পুঁজিপতিদের মধ্যে মৈত্রী তত দৃঢ় হয়েছে এবং এ কারণে আগে ভূমিসংস্কার আইনের যে সব সংশোধনী করা হয়েছে এখন আর তা যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। ফলে দেশি বিদেশি পুঁজির ক্রমবর্ধমান জমির খিদে মেটানোর জন্য 'পঃ বঃ ভূমিসংস্কার আইন'-এর একেবারে খোল নলচে পাল্টে ফেলা প্রয়োজন। এই জন্যই এবার বিধানসভায় নতুন সংশোধনী বিল আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নয়া আর্থিক নীতি গ্রহণের পর থেকেই দেশি-বিদেশি পুঁজি সমস্বরে 'আরও বেশি জমি দাও' বলে স্লোগান তুলতে শুরু করে। তখন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সমস্ত সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানায় — দেশের সমস্ত অনাবাদী ও পতিত জমি তাদের ৫০ বছরের জন্য লীজ দিতে হবে। শিল্পের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করার জন্য এরা অন্যান্য বিষয়ের সাথে ছোট জোত প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে বড় জোত সৃষ্টি করতে চাইছে। কারণ, বড় জোতই আধুনিক প্রথায় বিশাল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোত্তম ক্ষেত্র।

এখানে একটা কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। পুঁজিবাদে মুনাফা অর্জনের অর্থে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলেও শিল্পের সাথে তার একটা বিশেষ চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়াও আর যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হ'ল অনুকূল আবহাওয়া, উপযুক্ত মাটি ইত্যাদি। তাই শিল্পপণ্যের মত কৃষিপণ্য বিশ্বের যেকোন জায়গায় ইচ্ছামত উৎপাদন করা যায় না। ভারতের মত একটা বিশাল দেশে যে জৈববৈচিত্র্য রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা রয়েছে এমন কৃষিপণ্য ভারতে উৎপাদন করা সম্ভব এবং এদেশের সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন খরচ কমিয়ে বিশ্ববাজার থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জনও সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে ছোট ছোট জোত প্রথায় চাষ একটা বড় বাধা। একারণে ছোট জোত হটিয়ে বড় জোত গঠনের জন্য এরা জমির সিলিং সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তন এবং পারলে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে বহুদিন থেকেই। ভারতীয় পুঁজিপতিদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন 'অ্যাসোচেম' এ প্রসঙ্গে বলেছে — ''আমাদের ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন দরকার।'' একই সুরে সুর মিলিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কেরও দাবি —'কর্পোরেট সেক্টর যাতে বৃহৎ জোত গড়ে তুলতে উৎসাহ পায় এজন্য জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনের সংস্কার দরকার। (বিজনেস ইন্ডিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৩)

দেশি-বিদেশি পুঁজির এই দাবি সরকার যথেষ্ট তৎপরতার সাথে বাস্তবায়িত করছে। কর্ণাটকে জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনকে বাস্তবে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিহার, ওড়িশা, রাজস্থানে ভূমিসংস্কার আইনকে কখনও কার্যকর করা হয়নি। এক ছটাক বেনাম জমিও ওখানে উদ্ধার করা হয়নি। বরং দেখা গিয়েছে বেসরকারি সমবায়গুলিকে মোট জমি উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৪ হাজার একর। (সূত্র ঃ ভারত সরকারের গ্রামীণ অঞ্চল মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৮-৯৯)। এসব করা হয়েছে পতিত জমি উন্নয়ন ও বনসৃজনের নামে। আর এই উন্নয়নের কাজে যে পুঁজির প্রয়োজন তারও ব্যবস্থা করেছিল তখনকার কেন্দ্রের বিজেপি-তৃণমূল সরকার।

ফলে দেখা যাচ্ছে দেশিয় একচেটে পুঁজিপতি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ মিলে এদেশের কৃষিক্ষেত্রে এক অদ্ভুত জোটের জন্ম হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০০২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এক্ষেত্রে ১৭ হাজার কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে। গমের জায়গায় টমাটো, ধানের জায়গায় ফুলচাষ প্রাধান্য পাচ্ছে। কেরালায় বনাঞ্চল ও ধানচাষের জমির একটা বড় অংশকে রবার, কফি ও নারকেল বাগিচায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ফল কী হয়েছে সেখানে? শুধু কর্ণাটকেই ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১০,৯৫৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। এই আত্মহত্যার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে — বাণিজ্যিকীকরণের চাপে গ্রাম ভেঙে পড়ছে। (The village as an institution has crumbled under the presence of Commercialisation. — Economic and Political Weekly, 29.6.02) একই অবস্থা পাঞ্জাবে, অন্ধ্রে — সেখানেও মৃত্যুর মিছিল।

এই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গেও সৃষ্টি হতে চলেছে। এখানেও বিভিন্ন দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থা রাজ্য সরকারের কাছে তাদের পরিকল্পনা পেশ করেছে। কারগিল ইন্ডিয়ার রপ্তানি বিভাগের প্রধান সঞ্জীব আস্থানা বলেছেন — ''আমরা আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চাল সংগ্রহের কথা ভাবিনি। আমরা জানতে চাই পশ্চিমবঙ্গ আমাদের কী দিতে পারে, তারপরেই আমরা বিচার করব, সেগুলো আমাদের চাহিদা মেটাবে কিনা।'' মার্কিন এই কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি থেকে কীভাবে মুনাফা করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। ম্যাকিনসেও তাদের রিপোর্টে বলেছে, এখনই দশটা দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। সংবাদে প্রকাশ — ''ভারতের কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে আধুনিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেওয়া হয়ে থাকে মার্কিন বহুজাতিক পেপসিকোর শাখা সংস্থা ফ্রিটো লে কে। এই যোগসূত্র যিনি গড়ে তুলেছেন সেই মনু আনন্দ হাওড়ার সাঁকরাইলের উদাহরণ দিয়ে বলেন — এখানে ৮৫০ কৃষক ১০০০ হেক্টর জমির চাষ থেকে কাঁচামাল সরবরাহ করে।'' (আনন্দবাজার ১১-৮-০৫) অর্থাৎ এই রাজ্যে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ও সাধারণ কৃষকের সরাসরি যোগাযোগপর্ব শুরু হয়েছে। এইভাবে দেশি-বিদেশি পুঁজির কৃষিক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে।

এর সাথে যুক্ত হচ্ছে নগরায়ন (অর্থাৎ রিয়েল এস্টেট ব্যবসা), বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন ইত্যাদির প্রয়োজন। এই লেখার সময় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ''দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করতে ইন্দোনেশিয়ার সালেম গোষ্ঠীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। সালেম গোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার বেনি সান্তোসা গত ৩০ জুলাই কলকাতায় গিয়ে এই প্রকল্পের জন্য ৫১০০ একর জমি চেয়েছেন। সরকারি সূত্রের খবর, শিল্পের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আমলাদের নির্দেশ দিয়েছেন।'' (আনন্দবাজার ১০-৮-০৫) শুধু তাই নয়, হাওড়ায় সালেম গোষ্ঠীকে ৪০০ একর জমি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার অগ্রিম টাকাও নিয়ে নিয়েছে। ''ইন্দোনেশিয়ার ওই সংস্থা পশ্চিম হাওড়ায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৪০০ একর জমি কিনতে চেয়েছে বাজার দরেই। জমির দাম বাবদ প্রাথমিকভাবে তারা ২০ কোটি টাকার চেক সরকারকে দিয়ে দিয়েছে কয়েক মাস আগেই। টাকা পাওয়ার পর রাজ্যের পক্ষে কে এম ডি এ জমি অধিগ্রহণ করবে বলে ভূমিসংস্কার দফতরকে বলা হয়েছে।'' (ঐ, ৯-৮-০৫) রাজ্য সরকারের ভূমি সংস্কার দফতরের সচিব সুকুমার দাস বলেছেন, ''জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। তবে সালেম গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছে ২৫ একর জমি। আর জমি দেওয়া যাচ্ছে না। সরকার বাকি জমি অধিগ্রহণ করে দখলে রেখে দিচ্ছে। হস্তান্তর করতে পারছে না — আইনি বাধায়।'' (ঐ, ৯-৮-০৫) বিষয়টা তাহলে কী দেখা গেল? প্রচলিত আইনে বাধা আছে জেনেও রাজ্য সরকার সালেম গোষ্ঠীর কাছ থেকে জমির দাম বাবদ অগ্রিম ২০ কোটি টাকার চেক গ্রহণ করেছে এবং জমি অধিগ্রহণ করে নিজের দখলে রেখে দিচ্ছে। অর্থাৎ আইনি বাধা দূর হলে বা দূর করার পর সরকার এই জমি ওদের হস্তান্তর করবে। তাই জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন বাতিল করা এখন সিপিএম সরকারের বাধ্যবাধকতার স্তরে চলে গিয়েছে। দেশি-বিদেশি পুঁজির সেবায় কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করার ফলে এই পথে না গিয়ে তাদের উপায় নেই। এবং ইতিমধ্যেই শাসকদলের তরফে বলা হয়েছে যে, তারা আবার ভূমি সংস্কার আইনে সংশোধনী আনবে। জমির ঊর্ধ্বসীমা শিথিলের নয়া সংশোধনী বিলের দুটি ধারার তথাকথিত বিরোধিতা করে যিনি কৃষক স্বার্থের চ্যাম্পিয়ান সাজতে চাইছেন সেই ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা আবার কীভাবে বর্তমান আইনের আওতাতেই দেশি-বিদেশি

চারের পাতায় দেখুন

সদুত্তর নেই

''সালেমরা পশ্চিমবঙ্গে কী করতে চলেছে, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার স্পষ্ট করে কিছুই বলেনি। সরকারের নানা মুনি নানা সময়ে খেপে খেপে যেটুকু জানিয়েছে, তাহল, পাঁচ হাজার একরের বেশি জমিতে আধুনিক নগর তৈরি হবে, তাতে গলফ্ কোর্স থাকবে, একটা শিল্পাঞ্চল গড়া হবে, সেখানে আই টি হাব হবে, বায়োটেক হাব হবে, একটা ঝাঁ চকচকে রাস্তা হবে, সেই রাস্তা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সেতু দক্ষিণ ২৪ পরগণাকে কলকাতার সাথে সংযুক্ত করবে ইত্যাদি। আর বলা হচ্ছে, পনের বছরে ৪৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে এখানে। সেই বিনিয়োগের কতটা জমি বাসযোগ্য করে নগর প্রতিষ্ঠার কাজে লাগবে, কতটা কোন্ শিল্পে বিনিয়োগ হবে, কোন্ কোন্ শিল্প সেই শিল্প জোনে আসছে, কী তাদের চরিত্র, কত মানুষের চাকরি হবে তাতে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হবে, কতটা জলাজমি, কতটা ক-ফসলি জমি, কতজন মানুষ ঘরহীন হবেন, কত চাষী জমি হারাবেন, এসব কোনও প্রশ্নেরই উত্তর সরকার দেয়নি।.....

''যেসব জমিতে একদা শিল্প ছিল, অথচ বর্তমানে খাঁ খাঁ করছে সেসব চত্বর, কিংবা শিল্পের জন্য যেসব জমি চিহ্নিত রয়েছে, সেসব এলাকায় শিল্পায়নে লগ্নির আহ্বান না জানিয়ে কেন গ্রামের দিকে তাকানো? কেন চাষের জমিতে হাত? নৈহাটি থেকে বজবজ, অন্তত এক লক্ষ একর জমিতে শিল্প ছিল, এখন মরুভূমি। গঙ্গার ধারে এইসব তৈরি জমির দিকে কেন নজর পড়ছে না? কেন অবহেলায় টিমটিম্ করছে কল্যাণী? দুর্গাপুর, আসানসোলের শিল্পবলয়, হলদিয়া অথবা শিলিগুড়ির দিকে নজর নেই কেন? 'হার্ডকোর ইন্ডাস্ট্রি' বলতে যা বোঝায় তা তো এইসব অঞ্চলে অনায়াসেই হতে পারে?

মুশকিল হল, এইসব প্রশ্নের সদুত্তর সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। ফলে, এমন ধারণার অবকাশ থাকছেই যে, সালেমরা স্রেফ সবুজ জমি বাসযোগ্য করে তুলতে যা যা প্রয়োজন, তাই করবে। তারা শিল্প গড়বে না। সেখানে উপনগরী তৈরি হবে। গলফ্ কোর্স তৈরি হবে। বিনোদনের হাজারটা ব্যবস্থা থাকবে। সেইসঙ্গে জমি ডেভেলপ করে দেওয়া হবে যাতে শিল্পপতিরা সেখানে শিল্পস্থাপন করতে পারেন। সালেম গোষ্ঠী নাকি রাজ্যের অন্যত্র মোটর সাইকেল কারখানা খোলার জন্য মউ সই করেছে। তারা কিন্তু বলতেই পারত, সেই কারখানা তারা তাদেরই তৈরি দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিল্পাঞ্চলে গড়ে তুলবে, কিন্তু বলেনি। (প্রতিদিন, ২৬-৮-০৫)

জমি হারিয়ে কৃষক হবে ধনীর ঘরে কাজের লোক — মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি

তিনের পাতার পর

পুঁজিকে সিলিং উর্ধ্ব জমি সরবরাহ করা যায়, তার কৌশল বাতলেছেন। রেজ্জাক সাহেব বলেছেন — ''সালেম গোষ্ঠীর মতো যেসব বেসরকারি সংস্থা ২৫ একরের বেশি জমি চাইছে, তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যেতে পারে। সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের সংস্থা হলে আর উর্ধ্বসীমা আইনের বাধা থাকবে না। তখন তা সরকারি সংস্থা হিসাবে গ্রাহ্য হবে। যেমন হিডকো, আবাসন পর্ষদের সঙ্গে গঠিত যৌথ উদ্যোগের সংস্থাগুলি ছাড় পাচ্ছে।'' (ঐ, ৯-৮-০৫) রেজ্জাক সাহেবের এই পরামর্শ মেনে রাজ্য সরকার জমির উর্ধ্বসীমা আইন বাতিলের কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে আসবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ, কিছু দেশি-বিদেশি পুঁজি রাজ্য সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে গেলেও সবাই যাবে না। আবার না গেলে জমি দেওয়া হবে না, একথা বলার মত হিম্মতও রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের নেই। পুঁজির পায়ে আত্মসমর্পণ করার পর আর ওকথা বলা যায় না।

কিন্তু কাহিনির এখানেই শেষ নয়। রাজ্য সরকার নিজেই এখন জমির ব্যবসায় নেমে পড়েছে। রাজারহাট উপনগরী তৈরির সময় রাজ্য সরকার ৩৫০০ একর জমি কৃষকদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছিল। কত দাম দেওয়া হয়েছিল কৃষকদের? কোথাও কোথাও কাঠাপ্রতি ৫/৬ হাজার টাকা। আর এই জমি কী দামে বিক্রি করা হয়েছিল? তথ্য বলছে, রাজ্য সরকার কোল ইন্ডিয়াকে ১৫০ একর জমি বিক্রি করেছে কাঠা প্রতি ৯৪ হাজার টাকা দামে (সূত্র ঃ বিপন্ন পরিবেশ, ২০০০, নাগরিক মঞ্চ)। একই ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি বারুইপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সদর সরিয়ে আনার প্রশ্নেও। সংবাদে প্রকাশ — ''দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা সদর আলিপুর থেকে বারুইপুর সরিয়ে আনতে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরাই এবার ভরসা রাজ্য সরকারের। বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জেলা সদরের জন্য বারুইপুরে প্রয়োজনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি জমি অধিগ্রহণ করা হবে। বাড়তি জমি বিক্রি করে পয়সা জোগাড় করা হবে নতুন জেলা সদর কমপ্লেক্স্ তৈরির জন্য। নতুন জেলা সদরের জন্য জমি লাগবে ১০০ একরের কিছু বেশি। কিন্তু রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করা হবে ২৬৭০ একর।'' (সংবাদ প্রতিদিন, ৩১-৭-০৫) এই অধিগৃহীত জমি বিক্রি করে রাজ্য সরকার লাভ করবে ৩২০ কোটি টাকা।

তাহলে কী দেখা গেল? উপনগরী তৈরির অর্থাৎ রিয়েল এস্টেট ব্যবসার দেশি-বিদেশি পুঁজির কৃষিভিত্তিক শিল্প, বিশেষ করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন এবং রাজ্য সরকারের অর্থের জন্য জমি ব্যবসার প্রয়োজনে জমি — এই সবকিছু মিলিয়ে বিপুল পরিমাণ জমির দরকার এবং এ কারণে এই জমি পাওয়ার জন্য কৃষকদের জমি থেকে বিপুল সংখ্যায় উচ্ছেদ করাও দরকার। উন্নয়নের নামে রাজ্য সরকার এই কাজটাই সমানে করে চলেছে।

রাজ্য সরকারের এই উন্নয়নের পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই কত পরিবার জমিচ্যুত-গৃহচ্যুত হয়েছে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া এক কথায় অসম্ভব। তবে যতটুকু তথ্য পরিসংখ্যান জোগাড় করা গিয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় রাজারহাট উপনগরী তৈরি করতে ২৬ হাজার, বানতলা লেদার কমপ্লেক্স ও বারাসত-কুলপী লিংক রোড তৈরি করতে ৮ হাজার পরিবারকে উৎখাত করা হয়েছে। আর, সালেম গোষ্ঠীকে ৫১০০ একর জমি দিতে গেলে কী অবস্থা হবে তা মন্ত্রী রেজ্জাক সাহেবের মুখ থেকেই শোনা যাক্। তিনি বলছেন — ''একর প্রতি তিনটি পরিবার যদি ধরা হয় এবং পরিবার প্রতি যদি গড়ে চারজনকে ধরা হয়, তাহলে পাঁচ হাজার একর জমিতে পনেরো হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন — মানে, ৬০ হাজার মানুষ।'' (প্রতিদিন ১২-৮-০৫) অর্থাৎ বুদ্ধবাবুরা সালেম গোষ্ঠীকে জমি দিতে গিয়ে ১৫ হাজার পরিবারের ৬০ হাজার মানুষের সর্বনাশ করবেন।

বুদ্ধবাবুরা প্রায়ই বলে থাকেন — 'বিদেশি পুঁজি মানেই উন্নয়ন এবং উন্নয়ন মানেই কর্মসংস্থান।' এখন এই যে সালেম গোষ্ঠীকে জমি দিতে গিয়ে ১৫ হাজার পরিবারের উৎখাত করতে হবে তাদের জন্য কী ধরনের কর্মসংস্থান হবে? মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ থেকেই শোনা যাক। তিনি বলছেন — ''যাদের জমি নেওয়া হবে তাদের জন্য ওই উপনগরীতেই কাজের সুযোগ করে দেওয়া দরকার। যাঁরা উপনগরীর বাসিন্দা হবেন, তাদের বাড়িতে কাজের লোক দরকার। ধোপা, নাপিত, সব্জি বিক্রেতা, চৌকিদার, মালি, রক্ষণাবেক্ষণ — এইসব কাজে জমি হারানো চাষীরা ও তাঁদের পরিবার রোজগারের সুযোগ পেয়ে যাবেন'' (প্রতিদিন, ১২-৮-০৫)। ছিলেন তিন ফসলি জমির মালিক কৃষক, হয়ে গেলেন বাড়ির কাজের লোক — ঝি, চাকর; এই হল বুদ্ধবাবুদের উন্নয়নের আসল চেহারা।

'ভূমি সংস্কার সংশোধনী বিল - ২০০৫'-এ রাজ্য সরকার আর একটা সর্বনাশা জিনিষ করতে চাইছে। একথা আমরা সবাই জানি, রাজ্যে হাজার হাজার কারখানা আজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে এবং পরিণামে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছেন। মালিকেরা রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় শ্রমিকদের শত শত কোটি টাকা পি-এফ ও গ্র্যাচুইটি আত্মসাৎ করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া এই সমস্ত কারখানার জমির পরিমাণ কত তা সমীক্ষা করে দেখা হয় ২০০৩ সালে। দেখা যায় মাত্র ৫০০টি কারখানার উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ৪১ হাজার একর। বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত কারখানার জমি হিসাবে এলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে কয়েক লক্ষ একর। শিল্পপতিদের দৃষ্টি পড়েছে এই জমির দিকে। কিন্তু প্রচলিত আইনে এই জমি তারা হস্তান্তর বা লীজ দিতে পারে না। অথচ শহরাঞ্চলে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ একর এই জমি যদি বিক্রি করা বা অন্য কোন বাণিজ্যিক কাজে লাগানো যায় তবে তাদের ঘরে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা হিসাবে ঢুকতে পারে। এই জন্য শিল্পপতি-বান্ধব রাজ্য সরকার ওই সমস্ত জমি মিল মালিকদের বিক্রি করার অধিকার দিয়ে দিয়েছে। যদিও সাধারণ মানুষের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য 'মিলের উন্নয়ন', 'শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা মেটানো' ইত্যাদি কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এইসব কথার যে কোন অর্থ নেই তা বুঝতে রাজ্যবাসীর আর আজ কোন অসুবিধা হয় না। এইভাবে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা মিল মালিকদের পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে এবং এই কাজে বিধানসভায় কংগ্রেস, তৃণমূল — এরা সবাই বুদ্ধবাবুকে দু'হাত তুলে সমর্থন করেছে।

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের সুশাসনে গত ১৫ বছরে এই রাজ্যে মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষক জমি হারিয়েছে ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার বিঘা, খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ লক্ষেরও বেশি। সর্বস্ব হারিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ এখন আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করছে। তার উপর তথাকথিত উন্নয়নের নামে এইভাবে মানুষকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা গ্রামবাংলায় অতলান্ত অন্ধকার নামিয়ে আনবে। তাই এই প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা রুখতে হবে এবং তার জন্য গড়ে তুলতে হবে দুর্বার গণসংগ্রাম। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

'ভেল' ও সিপিএমের ভেলকি

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিঃ (ভেল)-এর বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে উচ্চৈঃস্বরে গলাবাজি করে সি পি এম নেতৃত্ব দেখাতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি রক্ষায় তাঁরা কত আন্তরিক! কিন্তু তাঁদের গলাবাজির অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ল কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)-এর এক সাম্প্রতিক প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে। এই চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে প্রকাশ যে, কেরালায় সি পি এম নেতৃত্বাধীন বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় এই 'ভেল'কে বঞ্চিত করেই রাজ্যের তিনটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের বরাত অনেক বেশি দামে পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল কানাডার একটি বহুজাতিক সংস্থাকে। যে 'জাতীয় স্বার্থরক্ষার' কথা বলে আজ তাঁরা ভেলের বিলগ্নীকরণের বিরোধিতার ভান করছেন, সেদিন কিন্তু সেই প্রশ্নে তাঁরা মোটেই বিচলিত হননি। তাঁদের এই জঘন্য দ্বিচারিতা তাঁদের আজকের এই প্রতিবাদের সততাকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ক্যাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৯৬ সালে কেরালায় তিনটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভেল ও লারসেন অ্যান্ড ট্রুব্রো যৌথ উদ্যোগে মেগাওয়াট পিছু ১ কোটি ২৫ লাখ টাকার টেন্ডার দিয়েছিল। আর ঐ একই কাজের জন্য কানাডার বহুজাতিক সংস্থা এস এন সি ল্যাভলিন, মেগাওয়াট পিছু ২ কোটি ৪২ লাখ টাকার টেন্ডার হাঁকে। কেরালা সরকারে তখন বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়ন, আজ যিনি রাজ্য সিপিএমের সম্পাদক ও পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য। তখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভেলের অপেক্ষাকৃত কম দামের টেন্ডারকে উপেক্ষা করে মেগাওয়াট পিছু ২ কোটি ৪২ লাখ টাকা দরেই ঐ বরাত কানাডার বহুজাতিক সংস্থার হাতেই তুলে দেওয়া হয়। ক্যাগের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী এর ফলে কেরালা সরকারের অন্তত ৩৭৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়।

এখানে এস এন সি ল্যাভলিন কোম্পানিটির প্রকৃত পরিচয় সিপিএমের দ্বিচারিতার আরেকটি দিক নগ্ন করে দেয়। কানাডার এই বহুজাতিক সংস্থাটি মূলত অস্ত্র তৈরি করে থাকে এবং সেই অস্ত্রের প্রধান ক্রেতা আমেরিকা। যুগোস্লাভিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, হাইতি সহ তারা দুনিয়াজুড়ে যে হানাদারি চালাচ্ছে, তাতে এইসব অস্ত্রশস্ত্র বহুল পরিমাণেই ব্যবহৃত। এখন সেইসব যুদ্ধের সহযোগী এই সংস্থাকে ঘরে ডেকে এনে বরাত পাইয়ে দেওয়ার ঘটনাই বুঝিয়ে দেয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও কোন ভূমিকা নিতে কেন সিপিএম আজ অপারগ। অবশ্য তাঁদের কথায় ও কাজে এই ধরনের দ্বিচারিতায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আজ আর বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণের প্রশ্নে কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে গলার শিরা-ফোলানো প্রতিবাদ ও পশ্চিমবঙ্গে নির্দ্বিধায় সেই একই নীতি অনুসরণ, গুরগাঁও-এর শ্রমিকদের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন ও পশ্চিমবঙ্গে চা-শ্রমিকদের চূড়ান্ত অপমানজনক চুক্তি মানতে বাধ্য করা এবং যেকোনও বিক্ষোভকে, তা সে যাদবপুরের ছাত্রদেরই হোক বা শ্যাওড়াফুলির সাধারণ বিদ্যুৎ-গ্রাহকদেরই হোক, পুলিশের লাঠির জোরে দমন করা — তাঁদের কথায়-কাজে এই ধরনের স্ববিরোধের উদাহরণ ভুরি ভুরি। আসলে মুখে গরম গরম বামপন্থী বুকনির শাক দিয়ে কি আর পুঁজিবাদের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বস্ততার আঁশটে গন্ধ আড়াল করা যায়!

সালিম গোষ্ঠীকে জমি দেওয়ার প্রতিবাদে

নাগরিক কনভেনশন

শিল্পায়নের নামে দক্ষিণ ২৪ পরগণার চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে হাজার হাজার বিঘা জমি একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের উপঢৌকন দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২২ আগস্ট বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জনপ্রতিনিধিদের আহ্বানে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অরূপ ভদ্র, বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার এবং এস ইউ সি আই দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য ও জয়নগর ১নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কমরেড অজয় সাহা, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে অমর ব্যানার্জী, সিপিআই(এম এল)-এর পক্ষে শিশির চ্যাটার্জী, এপিডিআর-এর পক্ষে প্রবীর পাল, পিডিএস-এর পক্ষে সমীর পুতুতুণ্ড ও অনুরাধা দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। কনভেনশনে বক্তারা বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা নদীনালা ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এখানে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য চাষ, বরফ কল, দূষণমুক্ত জলপরিবহন ও সর্বোপরি অসংখ্য জলাধার নির্মাণ করে খাল খনন করে জেলার কয়েক লক্ষ বিঘা জমিকে দু'ফসলি বা তিন ফসলি করা যেত, যেখানে বেকারদের কর্মসংস্থানের কিছু হলেও ব্যবস্থা হত। সরকার তা না করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে শিল্পায়নের ধুয়ো তুলে বড়লোকদের প্রমোদনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে যার সঙ্গে কর্মসংস্থানের কোন সম্পর্ক নেই। সমস্ত বক্তাই চাষীদের উচ্ছেদ করার সরকারি অপপ্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করে দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে গ্রামে গ্রামে চাষী কমিটি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

● সকল বেকারের কাজ ● বেকার ভাতা ● পরিচয় পত্র

● ট্রেনে বাসে বেকারদের কনশেসন দেওয়ার এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স বন্ধ ও অনলাইন লটারী নিষিদ্ধ করার দাবিতে

৬ সেপ্টেম্বর

জেলায় জেলায় রাস্তা অবরোধ

এ আই ডি ওয়াই ও

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছক প্রতিরোধ করল সোভিয়েট

(মহান নেতা স্ট্যালিনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীকে শেষপর্যন্ত ঠিক কীসের জোরে এবং কেমনভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েট ভূখণ্ড নয় — ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকেও ফ্যাসিস্ট-দখলমুক্ত করেছিল, সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জনগণের প্রতি নেতার আস্থা ও বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল — সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সোভিয়েটের জনগণ সমাজতন্ত্র চায়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে চেয়েছে, সেজন্যই সমাজতন্ত্র ভেঙেছে — এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী প্রচারের মোকাবিলায় আমাদের জানা দরকার কীভাবে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে। শোষিত জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীদের কাছে এ এক অমূল্য ইতিহাস — যা না জানলে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণাই অপূর্ণ থেকে যাবে, যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরও ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই সেদিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হল, এবার শেষ পর্ব। — সম্পাদক, গণদাবী)

৯ম ও শেষ পর্ব

মিত্র বাহিনীর আর্দেন বিপর্যয়

এরপর ছোটখাটো প্রতিরোধ ছাড়া বড় কোন লড়াই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে আর লড়তে হয়নি। এবার বিজয়ী মিত্রবাহিনী প্যারিস হয়ে এগুতে থাকে জার্মানি অভিমুখে। পথে কোন বাধা নেই। সারি সারি জার্মান ট্যাঙ্ক রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কোনটাতেই একফোঁটা জ্বালানি তেল নেই, একটা গোলাও নেই। সমস্ত জার্মান সেনা তখন সোভিয়েট-বিরোধী রণাঙ্গনে। দীর্ঘপথ নির্বিবাদে এগিয়ে তারা ৬৩ ডিভিশনের বিপুল সেনা নিয়ে জার্মানির সীমান্তে আর্দেন ও আলসেসে হাজির হল। সীমান্তে মোতায়েন জার্মান বাহিনী তখন সৈন্য সংখ্যায়, অস্ত্র বলে, বিমান সংখ্যার দিক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর তুলনায় অনেক দুর্বল।

এহেন দুর্বল শক্তি নিয়েই জার্মান বাহিনী ১৯৪৪-এর ১৬ ডিসেম্বর ভোরবেলা ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর উপর। মাৎসুলেনকো তাঁর 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখছেন, ''শুরু হয় বিশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ, যা কোন কোন জায়গায় পরিণত হয় আতঙ্কিত পলায়নে। মার্কিন সাংবাদিক আর ইনগেরসল লেখেন, 'জার্মান ফৌজ পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গণে আমাদের প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে ফেলে এবং ঐ বিদ্ধ স্থল দিয়ে বাঁধভাঙা জলের মত প্রবল বেগে হুড়মুড় করে ঢুকতে থাকে। আর ওদের হাত থেকে পশ্চিমাভিমুখী সমস্ত পথ দিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল আমেরিকানরা।' ...আর্দেনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী হারায় ৭৬ হাজার ৮৯০ জন সেনা। ...উত্তর আলসেস-এ ৭ম মার্কিন বাহিনীকে ঘিরে ফেলার ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আর্দেনের দক্ষিণে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণ-অভিযানের পরিকল্পনা হচ্ছিল ১ম ও ১৯তম বাহিনী দুটির শক্তিকে সম্মিলিত করে।''

মাৎসুলেনকো লিখছেন, ''এই পাল্টা আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল — বৃহৎ ট্যাঙ্ক শক্তির সাহায্যে আচমকা এক প্রবল আঘাত হেনে ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীগুলিকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে সম্মানজনক পৃথক শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করা।'' সোভিয়েট মার্শাল ঝুকভের ভাষায় ''হিটলার তখনও পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই ছিলেন যে, পশ্চিমী এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে একটা চুক্তিতে তাঁরা পৌঁছতে পারবেন, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে 'কমিউনিস্ট বিপদের' বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই চালাতে পারে।'' ফলে, ''১৯৪৫-এর জানুয়ারির প্রথম দিকেও পশ্চিম ইউরোপে মিত্রদের অবস্থা জটিলই থেকে যায়। উত্তর আলসেসে অবস্থিত ৭ম মার্কিন বাহিনীকেও নাৎসিদের কাছে মার খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পিছু হটতে হয়। মার্কিন সেনাপতি আইজেনহাওয়ারের সমস্ত মজুত শক্তি ফুরিয়ে যায়।'' তখন নিরুপায় মিত্রপক্ষ সোভিয়েটের শরণাপন্ন হয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক জরুরি পত্রে স্ট্যালিনকে লেখেন, ''পশ্চিম রণাঙ্গণে অত্যন্ত তীব্র লড়াই চলছে এবং যেকোন মুহূর্তে সেনাপতিমণ্ডলীকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আপনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে, ...শুরুতেই সাময়িক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যাওয়ার পর যখন এক অতি বিস্তৃত রণাঙ্গণ রক্ষা করতে হয়, তখন অবস্থা কত আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে আপনি কী করতে পারেন তা সংক্ষেপে জানতে জেনারেল আইজেনহাওয়ার সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন, এবং এটা তাঁর খুব দরকার। জানুয়ারি মাসে ভিশ্চুলা রণাঙ্গণে অথবা অন্য কোন স্থানে আমরা জার্মান বিরোধী বৃহৎ রুশ আক্রমণ-অভিযান প্রত্যাশা করতে পারি কি? ...আমি বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছি।'' (রাশিয়া অ্যাট ওয়ার, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ)। সোজা কথায়, ভিশ্চুলা বা এইরকম কোন জায়গায় জার্মান বাহিনীর উপর সোভিয়েট এমন আক্রমণ হানুক যাতে হিটলার ইঙ্গ-মার্কিন রণক্ষেত্র থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে সোভিয়েট রণাঙ্গনে চলে যেতে বাধ্য হয়; তাতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। স্ট্যালিন শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সোভিয়েট ফৌজের অভিযান আরম্ভের সময়টি জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রথমার্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসেন। ১২ জানুয়ারি বাল্টিক সাগর থেকে কার্পেথিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক অঞ্চল জুড়ে সোভিয়েট লালফৌজ আক্রমণ-অভিযান চালায়। এর ফলে, জার্মান বাহিনী পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ-অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পাঁচদিন পর চার্চিল তারবার্তায় স্ট্যালিনকে 'হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে' ধন্যবাদ জানান এবং 'পূর্ব ফ্রন্টে হিটলার বিরোধী ব্যাপক অভিযানের জন্য' অভিনন্দিত করেন। (সূত্র ঐ)। পরে ফেব্রুয়ারি মাসে স্ট্যালিন এক বিবৃতিতে বলেন, রুশ আক্রমণ নিঃসন্দেহে পশ্চিম ফ্রন্টে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ঘটনার পর, বিশেষ করে মার্চ মাসের পর আর একটি ক্ষেত্রেও জার্মান বাহিনীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। সবটাই লড়েছে সোভিয়েট লালফৌজ। ১৯৪৫-এর ২৭ মার্চ ২১তম আর্মি গ্রুপের সঙ্গে রয়টার-এর কথাবার্তার সময় ক্যাম্পবেল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন যে, কোনরকম জার্মান প্রতিরোধ ছাড়াই তারা জার্মান-রাজধানীর দিকে এগুচ্ছে। ১৯৪৫-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি মার্কিন বেতার ধারা-ভাষ্যকার জন গ্রোভার বলেন যে, বাস্তবে পশ্চিম রণাঙ্গণের আর কোন অস্তিত্বই নেই, সেখানে কোন লড়াই হচ্ছে না।

সোভিয়েটের অগ্রাভিযান ঠেকাতে ইঙ্গ-মার্কিন অপকর্ম

'রিয়া নোভস্তি' পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর এক গবেষক ভিক্টর লিটোভকিন এক ইন্টারভিউতে (দি স্টেটসম্যান, ৪-৫ মে '০৫) জানিয়েছেন, সোভিয়েট ফৌজ সোভিয়েট মুক্ত করার পরেও দেশে দেশে নাৎসীবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট সৈনিকের প্রাণ বলি দিতে গেল কেন, বিশেষত বার্লিন দখলে তারা এমন মরিয়া হয়ে উঠল কোন্ যুক্তিতে — আমি বহুদিন যাবৎ এর সঠিক উত্তর জানতাম না; পশ্চিমী সংবাদপত্র ও বিশেষজ্ঞরা বলতেন — এসব হচ্ছে স্ট্যালিন ও ঝুকভের গোঁয়ার্তুমি। কিন্তু গত ৫-৬ বছর আগে প্রকাশিত বৃটিশদের নিজস্ব ডকুমেন্ট পড়াশুনো করে এবং ৫০-এর দশকে প্রাপ্ত তথ্যগুলির তুলনা করতে গিয়ে ধাঁধার বহু জবাবই আমার কাছে পরিষ্কার ছবির মত ফুটে উঠেছে। দেখতে পেয়েছি সেই ১৯৪৫-এ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বৃটিশ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের গোপন ছক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাধিয়ে সোভিয়েট ধ্বংসের বৃটিশ প্রস্তুতি। মিত্রজোটের অংশীদার হয়েও যুদ্ধে সোভিয়েটকে তারা কেন সহযোগিতা করল না এবং পূর্বকৃত সমস্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে সোভিয়েটের এক্তিয়ারে পড়া পোলেইস্তি তৈলক্ষেত্রে, ড্রেসডেন, ওরিয়েনবুর্গ ইত্যাদিকে কেন তারা ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল — তাও আমার সামনে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে এই সত্যও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নাৎসীবাহিনী কেন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে কোন বাধা না দিয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছিল এবং এই বাহিনীকে দ্রুত বার্লিনে ঢুকে পড়ার জন্য কেন এমন স্বাগত জানাচ্ছিল; অথচ সোভিয়েট ফৌজের বিরুদ্ধে নাৎসিরা ভয়ঙ্কর হিংস্র লড়াই মারফৎ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেন প্রতিরোধ চালিয়ে গেল।

লিটোভকিন বলেছেন, ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ক্রিমিয়ায় ত্রিশক্তির (সোভিয়েট, বৃটেন ও আমেরিকা) ইয়াল্টা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; শেষ হয় ১১ ফেব্রুয়ারি। তিন রাষ্ট্রই রাজী হল যে, তাদের বিমানবাহিনী সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত এলাকার মধ্যে লড়াই চালাবে, কেউই এর অন্যথা করবে না। কিন্তু পরদিনই রাতে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান বাহিনী সোভিয়েট যুদ্ধ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ড্রেসডেনে এবং পরে শ্লেভাকিয়ার সর্বাধিক উৎপাদনশীল অঞ্চলে ব্যাপক বোমাবাজি করে সব ধ্বংস করে দেয় যাতে সোভিয়েট এসব এলাকায় ঢুকে ভাল কিছু না পায়। লালফৌজের দুরন্তগতি আটকাতে তারা ড্রেসডেনে এলবে নদীর উপর নির্মিত সমস্ত সেতুও ধ্বংস করে দেয়; সেখানকার ২৪ হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষকেও হত্যা করে। এর আগে ১৯৪৪ সালে রুমানিয়ার পোলেইস্তি তৈলক্ষেত্র লালফৌজের দখলে আসার মুখেই বিমান থেকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়েছিল তারা।

লিটোভকিন বলেছেন, এতদ্সত্ত্বেও সোভিয়েট কিন্তু ইয়াল্টা চুক্তির এতটুকু অবমাননা করেনি। একটা ঘটনাও তিনি এ প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। স্ট্যালিন বিদেশমন্ত্রকের ইউরোপিয়ান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আন্দ্রেই স্মিরনভকে ডেকে পাঠিয়েছেন সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলির বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য। স্মিরনভ এসে রিপোর্ট করেন যে, অস্ট্রিয়াতে সোভিয়েট সেনারা শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে ইয়াল্টা কনফারেন্সে নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করেও অনেকদূর ঢুকে গেছে এবং তাঁর প্রস্তাব — এই নতুন পজিশনেই আমাদের থাকা উচিৎ, দেখা যাক, একইরকম অবস্থায় আমেরিকা কী করে! তৎক্ষণাৎ স্ট্যালিন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি ভুল করছেন। মিত্রপক্ষকে এখনি টেলিগ্রাম পাঠান।' তারপর তিনি নিজেই লেখার জন্য বলে গেলেন, 'সোভিয়েট বাহিনী হ্যেরমাখট ইউনিটকে তাড়াতে তাড়াতে আমাদের পূর্ব নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে চলে গিয়েছে। আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, সামরিক অভিযান শেষ করেই সোভিয়েট বাহিনী চুক্তি নির্দিষ্ট এলাকাতেই ফিরে আসবে।' চুক্তির প্রতি সোভিয়েট কেমন নীতিনিষ্ঠ ছিল — এই ঘটনা তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছক প্রতিরোধ করল সোভিয়েট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা গেলেন ১৯৪৫-এর ১২ এপ্রিল, সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের ঠিক আগেই। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন হ্যারি ট্রুম্যান। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে তাঁর বেশ ভালই ঘনিষ্ঠতা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র বীভৎস চেহারাটা এবার তার নখ দাঁত বের করল। লিটোভকিন লিখেছেন, বৃটিশ নথিপত্র থেকে পরিষ্কার যে, ১৯৪৫-এর মার্চ থেকে অর্থাৎ আর্দেনসে জার্মান বাহিনীর হাতে মার খাওয়া এবং সোভিয়েট ফৌজের সহায়তায় বিপন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে আর কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। জার্মান সেনারা সোভিয়েটের লাল ফৌজের বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রে হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুললেও ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীর ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ না গড়ে তুলেই ইঙ্গমার্কিন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছিল, নয়ত পূর্বদিকে পিছিয়ে আসছিল। জার্মান কৌশল ছিল, সোভিয়েট-জার্মান রণক্ষেত্রের পুরো এলাকায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোল এবং লালফৌজকে আটকে রাখ যতক্ষণ না 'প্রকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন (virtual)' পশ্চিম ও 'প্রকৃত (real)' পূর্ব ফ্রন্টের মধ্যে মিলন ঘটে (অর্থাৎ, পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে পূর্বের জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর মিলন ঘটে) এবং ইউরোপের ঘাড়ে চেপে বসা 'সোভিয়েট আতঙ্ক' হঠানোর দায়িত্ব জার্মানদের হাত থেকে যতক্ষণ না ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী গ্রহণ করে।

লিটোভকিন আরও লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রুমানকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই বলে এবার বোঝাতে লাগলেন যে, তেহরান বা ইয়াল্টা কনফারেন্সে যেসব চুক্তি হয়েছে, সেসব মেনে চলবার আর কোন দরকার নেই। তাঁর মতে, এখন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ফলে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরিস্থিতি দাবি করছে যে, পূর্ব চুক্তি নির্ধারিত সীমানা ছাড়িয়ে আরও পূর্বদিকে আমাদের ঢুকে যেতে হবে। পটস্ডাম্ কনফারেন্সে বা অন্যান্য কনফারেন্সে সোভিয়েট জনগণের যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব যে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, চার্চিল তার বিরুদ্ধেও সরব হতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৪৫-এর এপ্রিলের শুরুতে জরুরি ভিত্তিতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আচমকা যুদ্ধের — 'অপারেশন আনথিঙ্কেব্ল্'-এর পরিকল্পনা তৈরির আদেশ জারি করলেন। নতুন যুদ্ধ শুরু করার তারিখও তিনি স্থির করে ফেলেছিলেন — ১ জুলাই, ১৯৪৫। আমেরিকান, কানাডিয়ান, পোলিশ এবং ১০-১২ ডিভিশন জার্মান সৈন্য এই সোভিয়েটবিরোধী অভিযানে অংশ নেবে। শ্লেজভিগ হলস্টাইন এবং দক্ষিণ ডেনমার্কের জাটল্যান্ডে আত্মসমর্পণ করা এই জার্মান সৈন্যবাহিনীকে ভেঙে না দিয়ে তাদের সযত্নে রাখা

ছয়ের পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

পাঁচের পাতার পর

হয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে। চার্চিলের যুক্তি — এখন সোভিয়েটের সহায়সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, মূল রণক্ষেত্র থেকে তাদের পশ্চাদ্‌ভূমির যোগাযোগ অনেক দূর পিছনে, ফৌজ ক্লান্ত, এবং সমরাস্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত; এই সেই সুবর্ণ সুযোগ যখন আমরা পশ্চিমীরা সোভিয়েটকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি এবং দাবি করতে পারি যে, সোভিয়েট হয় মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করুক নয়তো নতুন যুদ্ধের ভয়াবহতার মোকাবিলা করুক।

লিটোভকিন আরও বলেছেন যে, পশ্চিমে এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, ১৯৪৫-এর বসন্তে সহজ ইউরোপ বিজয়ের ফলে তাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এঁদের একজন হলেন মার্কিন জেনারেল জর্জ প্যাটন। তিনি উন্মত্তের মত দাবি করলেন, মার্কিন ফৌজের অভিযানকে অব্যাহত রেখে এলবে থেকে পোল্যান্ড ও উক্রাইনের ভিতর দিয়ে স্ট্যালিনগ্রাদে গিয়ে যুদ্ধ শেষ করতে হবে; যেখানে হিটলার পরাস্ত হয়েছে সেখানেই ওড়াতে হবে মার্কিন বিজয় পতাকা। রুশ জনগণ সম্পর্কে এই জেনারেলের ছিল তীব্র ঘৃণা; বলতেন - রুশরা 'চেঙ্গিজ খানের বাচ্চা।'

লিটোভকিনের গবেষণায় আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, এই প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের রাজি হওয়া সম্ভব ছিল না কতকগুলো কারণে এবং স্পষ্টভাষায় কারণগুলি তিনি জানালেনও। বললেন — (১) মার্কিন জনগণ এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা এখুনি মেনে নেবে না, তাদের মানসিকতা এখন সেই অবস্থায় নেই। (২) আমেরিকা তখনও জাপানের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে সেনা সরিয়ে এনে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে জাপ-বিরোধী রণক্ষেত্রে আমেরিকা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তাহলে জাপানের হাতে ১০ থেকে ২০ লক্ষ পর্যন্ত মার্কিন সেনার জীবন যাবে। এতটা ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করার মত অবস্থায় আমেরিকা নেই। (৩) সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা যত সহজ, বিজয় অর্জন তত সহজ হবে না। এমন মারাত্মক ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব।

আমেরিকার এই তৃতীয় সিদ্ধান্তের পিছনে আর্দেন-আলসাস লড়াইয়ের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। মাত্র কয়েক ডিভিশন জার্মান সেনার মহড়া নিতে পারেনি ইঙ্গ-মার্কিন প্রায় ১০০ ডিভিশন সৈন্য। জার্মান সৈন্য এমনই উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সেই লক্ষ লক্ষ জার্মান সেনা সোভিয়েটে ঢুকে পরাজয় বরণ করছে। এই অবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী তো সোভিয়েটের কাছে অতি তুচ্ছ। ফলে যুদ্ধ শুরু করা সহজ, কিন্তু জয়লাভ সুদূরপরাহত। অতএব সেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

লিটোভকিন আরও লিখেছেন, ১৯৪৫-এর এপ্রিলে সোভিয়েট ফৌজ যখন ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে করতে জার্মানীতে এসে পড়ে, তখন ইঙ্গ-মার্কিন বিমান বাহিনী চুক্তি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেই ঢুকে পড়ে এবং পটাস্‌ডাম ও ওরিয়েনবুর্গ-এ বোমা বর্ষণ করে সবকিছু একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। ওরিয়েনবুর্গে ছিল জার্মানীর বিখ্যাত পরমাণু গবেষণাগার; সেটি যাতে সোভিয়েট বাহিনীর হাতে গিয়ে না পড়ে তারজন্য সেই গবেষণাগার, তার বৈজ্ঞানিক বাহিনী, কর্মচারী বাহিনী ও যন্ত্রপাতি সহ সকল আবিষ্কার — সব ধ্বংস করে দেয়। সোভিয়েটের অপ্রতিহত বিজয় অভিযানকে সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দেয় যে, দেখ, আমাদের ইঙ্গ-মার্কিন আকাশবাহিনী কেমন দুর্ধর্ষ ক্ষমতার অধিকারী, ফলে সোভিয়েটের সামনে তখন যেকোন আত্মত্যাগের বিনিময়ে বার্লিন দখল আরও জরুরী হয়ে দেখা দেয়। ইঙ্গ-মার্কিন হুমকির পাল্টা হিসেবে তারা বোঝাতে চাইল যে, যুদ্ধের ফলাফল আকাশ বা সমুদ্রে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় স্থল যুদ্ধে; সেই যুদ্ধে সোভিয়েট লালফৌজ সবার থেকে অনেক এগিয়ে। অন্যদিকে, জার্মান নাৎসি বাহিনী তখন তার সব শক্তি দিয়ে সোভিয়েট ফৌজের গতিরোধ করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, চেষ্টা করছে — অন্তত লালফৌজের গতিটাকে স্তিমিত করে রাখতে। তাদের পরিকল্পনা — ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পশ্চিমদিকে দ্রুত জার্মানিতে ঢুকে পড়ুক এবং আগেভাগেই বার্লিনের দখল নিয়ে নিক। তাহলে তাদের সঙ্গে জার্মান বাহিনী মিলিতভাবে সোভিয়েট ফৌজের বিরুদ্ধে আবার একটা সর্বাত্মক লড়াই চালাবে। অর্থাৎ সেই বৃটিশ পরিকল্পনা — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা — চার্চিলের 'অপারেশন আনথিঙ্কেব্‌ল।' সাম্রাজ্যবাদীদের চিন্তায় কেমন অজানিত ঐক্য। বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদী নায়করা বিপরীত শিবিরে থাকলেও একই সঙ্গে একই ভাবনা ভাবছে।

না, তার আগেই, অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বার্লিনে পৌঁছানোর আগেই লালফৌজকে বার্লিন দখল করে ফেলতে হবে। ২৭ এপ্রিলের মধ্যেই লালফৌজ পৌঁছে গেল বার্লিনে। মার্শাল ঝুকভ ও মার্শাল কোনিয়েভ দেড় শতাধিক সেনাপতি সহ বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বার্লিনে প্রবেশ করলেন। ঝুকভের সৈন্যরা উত্তর-পূর্ব দিক ধরে এবং কোনিয়েভের সৈন্যরা দক্ষিণ দিক দিয়ে বার্লিনকে চেপে ধরল। শহরের পূর্বাংশ চলে গেল লালফৌজের দখলে; বার্লিনের প্রধান সড়ক উন্টের ফেন লিনডেনও লালফৌজ দখল করে নিল। বিরাট রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সত্ত্বেও বার্লিনের এক তৃতীয়াংশ হিটলারের হাতছাড়া। বৃটেন-মার্কিন-ফরাসী বাহিনী তখনও অনেক দূরে। তবু, ২৯ এপ্রিল জার্মানীর পক্ষ থেকে নাৎসি গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা হিমলার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠাল সোভিয়েটের কাছে নয়, বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের কাছে। ফ্যাসিস্ট জার্মান সরকারের শেষ মুহূর্তেও একটা অন্তিম চেষ্টা — বৃটেন-মার্কিন-ফরাসি বাহিনীর সহায়তা নিয়ে যদি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো যায়। কিন্তু তখন কোনও উপায় নেই, যুদ্ধ সোভিয়েটের নিয়ন্ত্রণে; সোভিয়েটকে বাদ দিয়ে কোন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। বৃটেন-আমেরিকা জানালো — শুধু আমাদের কাছে নয়, সোভিয়েটের কাছেও আত্মসমর্পণ প্রস্তাব পেশ করতে হবে। (সূত্র ঃ রুশ-জার্মান সংগ্রাম)

এদিকে হিটলারের দক্ষিণ হস্ত মার্শাল গোয়েরিং অকস্মাৎ পদত্যাগ করে কোথায় পালিয়েছেন, জেনারেল ডিয়েটমার ও ফন প্যাপেন বন্দী; ইটালির মুসোলিনী ও তাঁর প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্রাৎসিয়ানি ধরা পড়েছেন। ৩০ এপ্রিল মন্ত্রীভবনের ভূগর্ভস্থ গুপ্তকক্ষে আত্মহত্যা করলেন হিটলার ও তাঁর প্রচারসচিব গোয়েবলস। পরে হিমলারও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

সোভিয়েট সাঁজোয়া বাহিনী বার্লিনের বুক চিরে ছুটল রাইখস্ট্যাগ অভিমুখে। তীব্র নাৎসী প্রতিরোধ ভেঙে লালফৌজ শেষ পর্যন্ত ২ মে বিকাল ৩টায় জার্মানি পার্লামেন্ট রাইখস্টাগ গৃহের চূড়ায় উড়িয়ে দিল লালপতাকা — ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের পতাকা। ফ্যাসিবাদী জার্মানীর পতন ঘটল শুধু তাই নয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুপ্ত পরিকল্পনাও মুখ থুবড়ে পড়ল লালফৌজের বীরত্বের কাছে, মহান স্ট্যালিনের যুদ্ধ পরিকল্পনার কাছে। যে যুদ্ধ পরিকল্পনা কেবল বুদ্ধির কৌশল নয়, যার বনিয়াদ হল সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার প্রতি দায়বদ্ধতা। এ এমন এক যুদ্ধ কৌশল যা নিতে পারে সমাজতন্ত্র, যে ব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রকে নিজ রাষ্ট্র বলে মনে করে। এ যুদ্ধকৌশল নিতে পারেন তেমন একজন নেতা যিনি নিজে বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি; শ্রমিক, কৃষক দেশের সকল জনগণ, সেনা ও সেনাপতি সকলের শ্রদ্ধাভাজন। যাঁর নির্দেশে দেশের বিবেক প্রতিফলিত হয়। ৮ মে জার্মান সমরনায়করা বার্লিনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই সোভিয়েট, আমেরিকা ও বৃটেনের সেনাধ্যক্ষদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলেন।

প্রশ্ন হল, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হাতে গেস্টাপো বাহিনী এবং নাৎসি বাহিনীর যে সব বড় বড় অফিসার আত্মসমর্পণ করেছিল, তারা গেল কোথায়? পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই আশ্রয় লাভ করেছিল আমেরিকায়। তাদের অনেক মৃত্যুসংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এটা যে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য — তা ফাঁস হয়ে গেছে, যখন দ্বিতীয়বার তাদের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়। এদের নাম বদলে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা নিজেদের গোয়েন্দা বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং দেশ দেশে মার্কিন হানাদারি চালানোর ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করেছিল। অর্থাৎ আমেরিকার জার্মান ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা আসলে নিজেদের ফ্যাসিবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই।

জুলাই মাসে বার্লিনে বিজয় উৎসব উপলক্ষে 'ভিক্টরি প্যারেডে' অংশ নেওয়ার কথা ছিল তিন বিজয়ী রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতিদের। মার্কিন সেনানায়ক আইজেনহাওয়ার এবং বৃটিশ সেনানায়ক মন্টগোমারি অক্ষমতার জ্বালায় সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজি হলেন না। রুশ সমরনায়ক ঝুকভ একাই সেই প্যারেড প্রত্যক্ষ করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য বিশ্ববাসী অভিনন্দিত করেছে সোভিয়েট লালফৌজ ও মহান নেতা স্ট্যালিনকে। লালফৌজ বলেছে, আমরা লড়েছি একথা সত্য; কিন্তু এই জয়ের আসল কারিগর কমরেড স্ট্যালিন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী সমর-বিজ্ঞানকে বিশেষরূপে ঢেলে সাজিয়েছিলেন তিনি। সোভিয়েটের মার্শাল ঝুকভ লিখেছেন, ''সমর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ট্যালিনকে বহু বিষয়ের মৌলিক প্রবর্তক বলা যায়।'' মার্শাল কে ভরশিলভ লিখেছেন, 'সমরবিজ্ঞানকে যথার্থই আমরা 'স্ট্যালিনীয় সমর-বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছি। ... সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে এই সমরবিজ্ঞান বিকশিত ও শক্তিশালী হয়েছে।''

বিশ্ব যখন স্ট্যালিন বন্দনায় মুখর তখন স্ট্যালিন কিন্তু যুদ্ধজয়ের পুরো কৃতিত্ব দিয়েছেন সোভিয়েট জনগণকে। ১৯৪৫-এর ২৪ মে সোভিয়েট কমান্ডারদের এক সভায় তিনি বলেন, ১৯৪১-৪২ সালে যখন আমাদের সেনাবাহিনী পিছু হটছিল, যখন ইউক্রেন, বেলারুশিয়া, মোলডাভিয়া, লেনিনগ্রাদ অঞ্চল, বাল্টিক অঞ্চল, কারেল-ফিনিস রিপাবলিকের গ্রাম ও শহরগুলি শত্রুর হাতে ছেড়ে না দিয়ে আমাদের কোন উপায় ছিল না, সেদিন সোভিয়েট জনগণ না হয়ে আর কেউ হলে তাদের সরকারকে তারা বলতে পারত — আমরা যা চাই তা তোমরা দিতে পারনি; তোমরা গদি ছেড়ে দাও, আমরা সেখানে অন্য সরকার বসাব, যে সরকার জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়া করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের জন্য এনে দেবে নিরুপদ্রব জীবন। কিন্তু রাশিয়ার মানুষ তা বলেনি। কারণ, সোভিয়েট সরকারের নীতি যে অভ্রান্ত — সে বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই জার্মানির পরাজয় নিশ্চিত করতে তারা এগিয়ে এসেছিল। সোভিয়েট সরকারের উপর রাশিয়ার জনগণের অবিচল আস্থা — এই হল সেই অমোঘ শক্তি যা মানবসভ্যতার শত্রু ফ্যাসিবাদের সামরিক পরাজয়কে সুনিশ্চিত করেছে।

বাম জন বিকল্প মঞ্চের ডাকে

বিহার বন্‌ধ সফল

ভোটসর্বস্ব রাজনীতি নয়, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিহারে এস ইউ সি আই ও অন্য কয়েকটি বামপন্থী দল বাম জন বিকল্প মঞ্চ গড়ে তুলেছে। ক্রমবর্ধমান খুন-ধর্ষণ-ডাকাতি-অপহরণ-লকআউট-ছাঁটাই-দুর্নীতি-মূল্যবৃদ্ধি এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গত ২৪ আগস্ট এই মঞ্চের পক্ষ থেকেও বিহার বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়। এদিন এস ইউ সি আই, আর এস পি, এম সি পি আই, সি পি আই-এম এল (শ্রেণীসংগ্রাম) এবং কমিউনিস্ট সেন্টার অব ইন্ডিয়ার নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে কমরেডস্ শিউশঙ্কর ও অরুণকুমার সিংহ, তারাকান্ত প্রকাশ, জমিরুদ্দিন, নন্দকিশোর সিংহ, পার্থ সরকার এবং সতীশের নেতৃত্বে একটি বড় মিছিল পাটনার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ডাকবাংলো মোড়ে পৌঁছায়। সেখানে এক জনসভায় উপরোক্ত দলগুলির সমন্বয়ে গঠিত 'বাম জন বিকল্প মঞ্চ'-এর নেতৃবৃন্দ বলেন, রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে রাজ্যপাল বুটা সিংহ বিহারে কংগ্রেস-আরজেডি'র শাসন চালাচ্ছেন এবং জনজীবনে সমস্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। এরপর শত শত মানুষ আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন।

বৈশালী জেলায় কমরেড ইন্দ্রদেও রাও ও অন্যান্য এস ইউ সি আই কর্মীবৃন্দ আইন অমান্য করেন, মুজফফরপুরে সপ্তক্রান্তি এক্সপ্রেস ট্রেন অবরোধ করা হয়। এই জেলায় ২৫০ জন এস ইউ সি আই কর্মী গ্রেপ্তার হন। ভাগলপুরে কমরেডস সাধনা মিশ্র, দীপক মণ্ডল সহ বহু কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করেন, মুঙ্গের জেলা সম্পাদক কমরেডস্ দীপককুমার, প্রমোদকুমার ও অন্যান্য কর্মীরা গ্রেপ্তার হন। এছাড়াও বাঁকা, দ্বারভাঙ্গা, গয়া, অওরঙ্গাবাদ, রোহ্‌টাস, জেহানাবাদ, বেগুসরাই ও ভোজপুরে বন্‌ধের দিনে শত শত এস ইউ সি আই কর্মী গ্রেপ্তার হন। জন বিকল্প মঞ্চের আন্দোলনকেন্দ্রিক বক্তব্য জনসাধারণের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

বন্‌ধের সমর্থনে পাটনায় মিছিল

প্রতিবাদী কৃষকদের আইনঅমান্য

গ্রামে গ্রামে আন্দোলনের কমিটি গড়ে তোলার ডাক

একের পাতার পর

ট্রেন বন্ধ ছিল; বেশ কয়েক হাজার কৃষক ট্রেনে ও স্টেশনে আটকে পড়েছিলেন। রাস্তায় মিছিলকারী কৃষকদের উপর শাসকদলের মদতপুষ্ট একদল দুষ্কৃতীর আক্রমণে বেশ কয়েকজন কৃষক আহত ও রক্তাক্ত হন। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক কৃষকদের ঢল নেমেছিল রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বেলা দেড়টা থেকে। হাওড়া স্টেশন থেকে ৫ সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহকদের মিছিল এসে যখন যোগ দিল তখন গণেশ অ্যাভিনিউ, নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট, লেনিন সরণী, সব স্তব্ধ — যত দূর চোখ যায় কেবল হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ কৃষক।

অ্যাবেকা এদিন কৃষকদের মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিল। নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সহ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলা থেকে বাস-ট্রাক ভাড়া করে, ট্রেনে চেপে কৃষকরা এসেছিল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে তাদের সমস্যার কথা জানাতে। মিছিল শুরু হওয়ার আগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি লক্ষ্মণ সমাদ্দার। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা স্মারকলিপি পাঠ করে শোনান সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিসহ সর্বস্তরের বিদ্যুৎ মাশুল ভারতবর্ষের সব রাজ্যের তুলনায় বেশি রয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও সিইএসসি লাভজনক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছরই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের দুটি রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ক্ষুদ্র কৃষকদের বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। পাঞ্জাবে কৃষকদের ২৫ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যে কৃষিতে বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ পয়সা ইউনিট। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মিটারবিহীন কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের মাশুল দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩.৫০ টাকা ইউনিট। এর ফল দাঁড়াবে মারাত্মক। কৃষক জমি বিক্রি করে দিতে, অথবা চাষ, বিশেষভাবে বোরো চাষ, বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে এবং ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকদের মতোই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে। রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী কৃষকদের এই গভীর সংকটের সমাধান না করে মিথ্যা প্রচারে নেমেছেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, সদিচ্ছা থাকলে বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ নং ধারা প্রয়োগ করে যেকোন মুহূর্তে এই বর্ধিত মাশুল রাজ্য সরকার বাতিল করে দিতে পারে। স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, এবছর কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের উপর ব্যাপক আর্থিক আক্রমণ নেমে আসার কারণ হ'ল বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে বিশ্বায়নের কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশ। বিশ্বায়নের নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে বাজার সঙ্কট থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের আজ অনুন্নত, আধা উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষি বাজার দখলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থেই কৃষকদের উপর এই মারাত্মক আক্রমণ নেমে এসেছে। কৃষক হত্যার এই পরিকল্পনাকে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত রূপায়িত করে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ক্ষমতার আসনে থাকার এবং কেন্দ্রের ক্ষমতালাভের পুরস্কার পেতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাই এই সরকার এক মুখে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর বিরোধিতা এবং অন্য মুখে তার বলিষ্ঠ সমর্থক — এই দ্বিচারিতার পথ গ্রহণ করেছে। সেই কারণে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩কে আরো কঠোর, জনস্বার্থবিরোধী অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রূপ দিতে গত ২৮শে জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ''বিদ্যুৎ আইন পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী ২০০৫'' নামের বিল পাশ করানো হয়েছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের হাতে পুলিশী ক্ষমতা ও বিচারের ক্ষমতাকে তুলে দিয়ে আন্দোলনকারীদের দমন করা।

স্মারকলিপিতে ৬ দফা দাবি জানিয়ে বলা হয়েছে, ''আজ আমরা হাজারে হাজারে এসেছি আপনাকে আমাদের দাবি মেনে নিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎগ্রাহকদের, বিশেষত কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের রক্ষা করার জন্য। কিন্তু যদি প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে আমাদের দাবিকে অস্বীকার করা হয় তাহলে আন্দোলন আরো ব্যাপক রূপ নেবে। লাঠি, গুলি দিয়ে সে আন্দোলন ধ্বংস করা যাবে না। তার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।''

স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয় —

(১) অবিলম্বে বিদ্যুৎ আইনের ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে কৃষিতে বর্ধিত বিদ্যুৎমাশুল প্রত্যাহার করতে হবে।

(২) আগামী বছর থেকে কৃষিতে ক্ষুদ্র চাষীকে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ এবং অন্যান্যদের ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে।

(৩) কৃষিতে বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যেই মিটার দিতে হবে এবং মিটারবিহীন সাপ্লাই বন্ধ করতে হবে।

(৪) ক্ষুদ্র শিল্পে ফিক্সড্ চার্জ বাতিল করতে হবে।

(৫) গৃহস্থ, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১টাকা ইউনিট বিদ্যুৎ দিতে হবে।

(৬) স্বৈরাচারী বিদ্যুৎ বিল ''বিদ্যুৎ আইন পশ্চিমবঙ্গ ২০০৫'' বাতিল করতে হবে।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস তাঁর ভাষণে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিশেষত কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আপনারা গ্রাম বাংলার দূর-দূরান্তর থেকে অনেক আশা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক আগে বলা সত্ত্বেও আপনাদের কোন তোয়াক্কা না করে পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমিতে উপনগরী বানাবার পুঁজি আনার কথা বলে সিঙ্গাপুর ও জাকার্তায় ছুটেছেন। এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রীর দয়িত্বে আছেন আমরা তাঁর কাছে যাচ্ছি, কিন্তু তিনি দেখা না করলে, দাবি না মানলে আমরা মাথা নীচু করে ফিরে যাবো না। প্রতিবাদে আইন অমান্য হবে। আপনারা রাজি আছেন কিনা বলুন।'' সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার চাষী সমর্থনে গর্জে ওঠেন। শুরু হয় দৃপ্ত মিছিল মহাকরণের দিকে। মিছিল তো নয়, এ ছিল জনস্রোত। মেজাজ ছিল বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতো। মিছিলের মুখ যখন এস এন ব্যানার্জী রোড ও জহরলাল নেহেরু রোডের সংযোগ স্থলে তখনও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে হাজার হাজার মানুষ মিছিলে যোগ দেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। চৌরঙ্গী থেকে মৌলালী, নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট, লেনিন সরণী, সি আর অ্যাভেনিউ সহ গোটা মধ্য কলিকাতা ছিল স্তব্ধ। মিছিলের সামনে লাঙল জোয়াল কাঁধে নিয়ে হাঁটছিলেন এক কৃষক। 'বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারা প্রয়োগ করে বর্ধিত মাশুল ও বকেয়া প্রত্যাহার করতে হবে', 'সব কৃষি গ্রাহককেই মিটার দিতে হবে', 'মিটার ভাড়া ৪৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা চলবে না' প্রভৃতি স্লোগান দিতে দিতে মিছিল এগিয়ে চলে।

হুগলি জেলা থেকে এসেছেন বোরো চাষী আকবর আলি মণ্ডল। তিনি বললেন, 'আমি বামফ্রন্টেরই লোক। কিন্তু সরকার আমাদের পেটে লাথি মেরেছে। দুমাস আগেও বিল দিয়েছি ৬,৭৭০ টাকা, এখন দিতে হবে ১৪ হাজার টাকা। সরকার পেয়েছেটা কী?' হরিণঘাটার কৃষক মোহিত মণ্ডল বুক চাপড়ে বললেন, 'আমরা শেষ হয়ে গেছি। আমাদের চোখে জল।' 'সার ও বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, ফসলের দাম নেই, আমরা বাঁচবো কী করে? তাই একটা পথ বের করতে এই আন্দোলনে এসেছি, বললেন আনসার আলি, হরিণঘাটার কৃষক। বোঝাই যাচ্ছে এই মিছিলকে ঘিরে চাষীদের মধ্যে একটা আশার আলো জেগেছে। অ্যাবেকার ডাকে সাড়া দিয়ে বীরভূমের চাষী কল্যাণ সমিতি, বৈদ্যুতিক স্যালো-সাবমার্সিবল কৃষিজীবী সমিতি, বাঁকুড়ার কৃষক বাঁচাও সমিতি, বদরহাট মোটর ক্ষেতমজুর সংগঠন, সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন মিছিলে সামিল হয়েছে।

রানী রাসমণি রোডে পুলিশ বাহিনী মিছিল আটকালে পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশে কৃষকরা বলতে থাকে, 'আমাদের চাষ করা ফসল খেয়েই আপনারা বেঁচে আছেন, আমাদের কেন আটকাচ্ছেন, রাইটার্সে যেতে দিন।' মিছিলের স্রোতের ধাক্কায় পুলিশও পিছোতে থাকে। জনস্রোত চলে যায় মেয়ো রোড পর্যন্ত। পুলিশ তখন সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দলকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। এই প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন, সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলী এবং প্রদ্যুৎ চৌধুরী, অনুকূল ভদ্র, স্বপন নাগ। তাঁরা অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী মহঃ আমিনের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিলে তিনি স্মারকলিপিটি পাঠ করে বলেন, 'এসব সমস্যার বিষয়ে আমি জানিনা। ফলে আমি কিছু বলতে পারবো না।' তিনি বলেন, 'মিটার ছাড়া বিদ্যুৎ দেওয়া ঠিক নয়, কেন দেওয়া হচ্ছে জানিনা। কীভাবেই বা মিটারবিহীন বিদ্যুতের দাম ঠিক করা হচ্ছে?' তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের স্মারকলিপি ওনাকে পাঠিয়ে দেবো এবং আপনাদের সাথে আলোচনার জন্য বলবো।'' প্রতিনিধিরা এই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হতে না পারায় সমবেত বিক্ষোভকারীদের আইনঅমান্য করার জন্য আহ্বান জানান। শুরু হয় আইনঅমান্য। আইনঅমান্য চলাকালীন মহাকরণ থেকে ফিরে এসে সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বিক্ষোভকারীদের সামনে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীর হতাশাজনক বক্তব্য তুলে ধরলে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তিনি বলেন, এর জবাব আমাদের দিতে হবে। আন্দোলনকে আরো দৃঢ় এবং ব্যাপক করতে হবে। এলাকাভিত্তিক অবরোধ হবে। লাগাতার রাস্তা অবরোধ করতে হবে, আর চলবে লাগাতার বিল বয়কট, যাতে সরকার বাধ্য হয় আমাদের ডেকে সমস্যার সমাধান করতে। তিনি কৃষকদের উদ্দেশে বলেন, পুলিশ লাইন কাটতে গেলে তাদের বলুন, জনস্বার্থে এই আন্দোলন, আপনারা গরিব মানুষের লাইন কাটার হাতিয়ারে পরিণত হবেন না। জোর করে কাটতে গেলে প্রতিরোধ করুন। শপথ নিন, গ্রামে গ্রামে আন্দোলন কমিটি গঠন করুন। এরপর হাজার হাজার কৃষকের কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে — 'বাংলার সব কারাগার ভরিয়ে দাও।'

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

জ্বালানি দূষণ ঠেকাবার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে

সেমিনারে বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার

২৪শে আগস্ট জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেটের উদ্যোগে কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ পরিবহন দূষণ রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সেমিনার আহ্বান করা হয়েছিল। পরিবেশবিদরা ছাড়াও ঐ সেমিনারে বক্তা হিসাবে এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকেও উদ্যোক্তারা আমন্ত্রণ জানান। হঠাৎ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় দেবপ্রসাদ সরকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পেরে লিখিত বক্তব্য পাঠান।

এবছর ৩১শে ডিসেম্বরের পর ১৯৯০ সালের আগের মডেলের বাস চলতে দেওয়া হবে না — এই মর্মে সরকারি ফতোয়ার বিরুদ্ধতা করে সেমিনারে পরিবেশবিদরা বলেন — বর্তমানে রাজ্য সরকারের কাছে দূষণ মাপার আধুনিক যন্ত্রই নেই, তার ব্যবস্থাও নেই। তাঁরা বলেন বয়স দিয়ে নয়, নির্গত ধোঁয়ার দূষণের মাত্রা বিচার করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সেমিনার উপলক্ষ্যে অ্যাকাডেমির সামনে রাজপথে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে দেখানো হয়, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করায় একটি ১৯৭২ ও একটি ১৯৮৫ সালের বাসের দূষণ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে কম। অথচ ২০০৫ সালের মডেলের নতুন বাসের দূষণ তুলনায় বেশি। এই প্রমাণের ভিত্তিতে বাস মালিকরা দেখাতে চেয়েছেন, নিছক বয়স মেপে বাস বাতিল করা অবৈজ্ঞানিক।

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন — বাতিল নয়, বাস রক্ষণাবেক্ষণের উপরে বিশেষ জোর দিতে হবে। পরিবেশ রক্ষা করতেই হবে, সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য গণপরিবহণ ও অটো'র জন্য পেট্রল-ডিজেলে কর ছাড় দিয়ে রেশনে সস্তায় তেল দিতে হবে। সরকারকে ট্রাফিক দপ্তরের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে এবং রাস্তাঘাট সারাতে হবে, যাতে টায়ার ও যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের খরচ কমিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে, কিন্তু কোন অবস্থায় যাত্রীদের ওপর বাড়তি ভাড়ার বোঝা চাপানো চলবে না।

তিনি বলেন, তুলনামূলকভাবে অনেকখানি দূষণহীন জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে দিল্লি ও মুম্বইতে। দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাই শহরের পরিবহণ পুরোপুরি সরকারি এবং চার কিলোমিটারের সর্বনিম্ন স্তরে ভাড়া এখনো ২ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার পরিবহণ ব্যবস্থাটি পুরো মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দিয়েছে।

তিনি বলেন, পরিবহণ এবং পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নকে মুনাফার দৃষ্টিতে দেখা চলতে পারে না। পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে সরকারি তহবিল থেকে খরচ করতে হবে, একে ভরতুকি হিসাবে দেখা চলবে না। তিনি সমগ্র রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে সরকারের আওতায় এনে, কঠোর দূষণবিধি অনুসরণ করা এবং সেজন্য বর্তমান অবস্থার পুরো রদবদল ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার দিক তুলে ধরেন।

বৃত্তি পরীক্ষা বহাল থাকছে

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে ২১ আগস্ট কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বিশেষ জরুরি সভায় গৃহীত প্রস্তাবে রাজ্য সরকার আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণীর ডায়গনস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট নামক পরীক্ষাকে প্রহসন আখ্যা দিয়ে বলা হয় — শিক্ষার উন্নতিতে এর আদৌ কোন গুরুত্ব নেই।

পক্ষান্তরে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা ক্রমাগত জনপ্রিয় হচ্ছে এবং অধোগামী শিক্ষার মানকে কিছুটা হলেও প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে। চার লক্ষাধিক মানুষ ইতিমধ্যেই মতামত প্রদানের মাধ্যমে এই পরীক্ষার প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় — শিক্ষার স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে বৃত্তি পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হবে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষেও এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল। প্রস্তাব পেশ করে বক্তব্য রাখেন পর্ষদ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পর্ষদ সভাপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে না পারায় পর্ষদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে তাঁর লিখিত বার্তা সভায় পড়ে শোনান হয়।

মালিক সিপিএমের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াই

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ যে, কেরালা রাজ্য সিপিএমের বর্তমানে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৪০০০ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা (৫-৬-০৫) জানাচ্ছে, এই টাকা তারা বর্তমানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিনিয়োগও করতে চলেছে। টেলিভিশন চ্যানেল, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, থিম পার্ক, এয়ার কণ্ডিশনড্ অডিটোরিয়াম, আধুনিক হসপিটাল, সুপার মার্কেট, আই টি পার্ক বা বিভিন্ন ধরনের উচ্চ পেশাভিত্তিক কলেজ — কী নেই তাদের সেই বিনিয়োগ পরিকল্পনায়!

শুধু একটা জায়গাতেই গোল। কী আশ্চর্য! তবে যে তাঁরা বলেন, তাঁরা কমিউনিস্ট দল! তাঁদের লক্ষ্য নাকি 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'! জনগণের মুক্তি, পুঁজির শোষণ ও শাসনের অবসান! সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা! এ তো তার বদলে পুঁজিবাদের মুনাফার লক্ষ্যে পুঁজি বিনিয়োগের নীতিকেই শিরোধার্য করে নিয়ে তাতেই অংশ নেওয়া। শ্রমিকের মুক্তির স্বপ্ন ও সংগ্রামকে নিছক কথার কথায় নামিয়ে এনে চলতি শোষণমূলক ব্যবস্থারই অংশীদারীত্ব। এরপর আর তাদের মুখে বড় বামপন্থী বুলি মানায় কি? মানুষ বুঝবে কী করে যে, তারা একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল, কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়? সচেতন মানুষের মনে উঠতে থাকা এসব প্রশ্নের জবাব আজ সিপিএম নেতৃত্বের কাছে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

পুঁজিবাদের নিয়ম মেনে লাভের ভিত্তিতে কোনও প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে, অনিবার্যভাবেই তা একটি শ্রমিক শোষণের হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়। শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্যই হচ্ছে মুনাফার মূল ভিত্তি — তা শুরুতে সে প্রতিষ্ঠান যত মহৎ উদ্দেশ্যেই শুরু হোক না কেন। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দানা বাঁধতে থাকে শ্রমিক অসন্তোষ — যার বর্শামুখ ধাবিত হয় একদা কথিত শ্রমিকবন্ধু থেকে আজ মালিকে পর্যবসিত হওয়া সেই কর্তৃপক্ষের দিকেই। সম্প্রতি এরকমই একটি ঘটনা কেরালার সিপিএমকে খুব অস্বস্তিকর অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে।

কান্নুরে দীনেশ বেদী কো-অপারেটিভের প্রায় ১৭ হাজার শ্রমিক আজ অনিয়মিত ও স্বল্প মজুরি এবং ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই খবরের নতুনত্ব হল এই যে, এই মালিকপক্ষ আর কেউ নয় সিপিএম দল নিজেই। ১৯৬৯ সালে কান্নুরের বেকার শ্রমিকরা প্রত্যেকে ১ টাকা করে চাঁদা দিয়ে এই দীনেশ বেদী কো-অপারেটিভ গড়ে তোলেন। সে সময়ের কেরালার ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সরকারও ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে এই কো-অপারেটিভের শেয়ার কিনে একে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া সরকার থেকে সেই সময় প্রায় ৭ লাখ টাকা ঋণ বাবদ দেওয়া হয়। স্বভাবতই এই সংস্থার পরিচালন ক্ষমতা সম্পূর্ণ দলীয়ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হত। শ্রমিকদের নিজেদের টাকায় গড়ে ওঠা এই সংস্থাকে এমনকী একসময় সিপিএমের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের স্বার্থে কারখানা পরিচালনার একটি ইউনিক মডেল হিসাবেও দাবি করা হত। আজ সেখানে মালিক সিপিএমের বিরুদ্ধেই শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। পরিস্থিতিটা দলের পক্ষে তাই অস্বস্তিকর বটেই।

আসলে সিপিএমের মত দলের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। ব্যবসায়ীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে তাঁদের সমস্ত কথাই লোক দেখানো, বামপন্থী দল হিসাবে দেশের শ্রমজীবী মানুষের বিশ্বাস অর্জন করার বা বজায় রাখার প্রয়োজনে যা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাঁদের দরকার। এখানে তাঁদের বামপন্থী বুলি বা ভাবমূর্তি এবং তার মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনের উপর নিয়ন্ত্রণ বাস্তবে পুঁজিবাদেরই সহায়ক। পুঁজির অবাধ শোষণের পথ নিষ্কণ্টক রাখাতেই তার প্রধান উপযোগিতা। আর এই ভাবমূর্তির প্রশ্নটুকুকে সরিয়ে রাখলে, তাঁদের সাথে বাস্তবে দক্ষিণপন্থী দলগুলির বা বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলির স্বার্থের ফারাক নামমাত্রই। আর ঠিক সেই কারণেই কোচিতে প্রস্তাবিত তথ্যপ্রযুক্তি নগরীর বিরোধিতায় বিদেশি বিনিয়োগ আর শ্রমিক শোষণের অভিযোগ তুলে তাঁরা যখন এত সরব, ঠিক তখনই তাঁদেরই পরিচালিত দীনেশ বেদী কো-অপারেটিভ কর্তৃপক্ষ আই টি পার্কে বিনিয়োগের পরিকল্পনায় মশগুল। প্ল্যাচিমাড়াতে কোকাকোলা কারখানার বর্জ্য পদার্থে পানীয় জল দূষিত হয়ে উঠছে বলে তাঁরা একদিন আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেই কোকাকোলা কোম্পানি নিজেদের আত্মরক্ষার্থে সেদিন যে আইনি যুক্তির জাল বুনেছিল, আজ কান্নুরে সিপিএম যে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক গড়ে তুলছে, সেখানে জলপ্রমোদের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়ে তাঁরা সেই আইনি ঢালই ব্যবহার করছেন।

তাই সিপিএম নেতৃত্বের বামপন্থা আজ দক্ষিণপন্থারই আরেক রূপ। বরং তা অনেক ক্ষেত্রে খোলাখুলি দক্ষিণপন্থার থেকেও ভয়ঙ্কর। কারণ বামপন্থার মুখোশ তাদের চেনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে। তারা বামপন্থার মুখোশ পরে অজস্র ঘাম রক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে বিপথে চালিত করে মানুষকে গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ায় ও পুঁজির শোষণ নিষ্কণ্টক রাখে। শুধু তাই নয়, বামপন্থার নামে এদের দক্ষিণপন্থী সুলভ কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের চোখে বামপন্থার আদর্শকেই কালিমালিপ্ত করে, আরও বিভ্রান্তি ছড়ায়, প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলন গড়ে ওঠার পথকে আরও জটিল ও কঠিন করে তোলে। এদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিয়ে মানুষ যতদিন না প্রকৃত বামপন্থী নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারবে, গণআন্দোলনের মাধ্যমে এইসব দলের বামপন্থী মুখোশ খুলে দিতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের কষ্টসাধ্য আন্দোলনও সঠিক নেতৃত্বের অভাবেই বারেবারে দিগ্‌ভ্রান্ত হবে। পরিশেষে যে পুঁজিবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে এই লড়াই সেই পুঁজিবাদকেও প্রকারান্তরে তা শক্তিশালী করবে যা আজ দেখা যাচ্ছে কেরালায়, পশ্চিমবঙ্গে। পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বের মধ্যে আপোসরফার কাজ করা এই সিপিএমের মত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলি এইজন্যই প্রকৃত বিপ্লবী লড়াই-এর পথে এত বিপজ্জনক। কেরালার ঘটনাপঞ্জী তাঁদের ছদ্ম বামপন্থী মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই কদর্য পুঁজিবাদী মুখটিকেই চিনিয়ে দেয়।

বেলেদুর্গানগরে সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধীদের হামলা

কুলতলি বিধানসভার বেলেদুর্গানগর অঞ্চলের দক্ষিণ ও মধ্য বেলেদুর্গানগর ও পশ্চিম রূপনগর গ্রামে বর্গাপ্রাপ্ত ভাগচাষী ও নিম্নচাষীরা তাদের নিজেদের জমিতে চাষ করতে গিয়ে এবছর শাসকদল সিপিএম-এর স্বার্থান্বেষী মহল এবং তাদের আশ্রিত সমাজবিরোধীদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হচ্ছিল। জয়নগর ২নং ব্লক স্তরে সমস্ত দলের ও প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে পদস্থ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিভাবে যে সমস্ত চাষীদের চাষ করার অনুমতি ও অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাদের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হামলা কয়েকদিন ধরেই চলছিল। এরমধ্যেই চাষীরা সংগঠিতভাবে তাদের জমিতে চাষ করছিল। গত ২৪ আগস্ট বুধবার পশ্চিম রূপনগরে নওসের গাজীর জমিতে স্থানীয় মজুর ও চাষী পরিবারের লোকরা যখন ধান রোয়ার কাজ করছিল তখন সিপিএমের কুখ্যাত সমাজবিরোধী আহাদ গাজীর নেতৃত্বে কুলতলির বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৫০/৬০ জন সশস্ত্র সমাজবিরোধী চাষী ও মজুরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতস্তত বোমা ও গুলি ছুঁড়তে থাকে। এই সময়ই গুলিতে এস ইউ সি আই কর্মী ও গ্রামীণ মজুর আনন্দ হালদার ও হসমা মণ্ডল আহত হয়। দুষ্কৃতীরা অপর এক এস ইউ সি আই কর্মী ও গ্রামীণ মজুর স্বপন নস্করকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের চেষ্টায় পুলিশ আহত অবস্থায় স্বপন নস্করকে উদ্ধার করে। পরে পুলিশ প্রশাসন সিপিএম সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে স্বপন নস্কর সহ বেলে-দুর্গানগর অঞ্চলের ১৯ জন নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে জেলা সম্পাদক ইয়াকুব পৈলান এক বিবৃতিতে বলেন, 'অবিলম্বে চাষীদের উপর আক্রমণকারী সিপিএম সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, বর্গা ও পাট্টাপ্রাপ্ত চাষীদের যেকোন মূল্যে জমি ও চাষের অধিকার রক্ষা করতে হবে।''

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in